182. Ac. 915. 10.

সচিত্র

নব্য জাপান।

যশোহর-জেলার মথুরাপুর নিবাসি—

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই, (জাপান);
এম, আর, এ, এস, (লণ্ডন),

কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা
১৯৫।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীদেবকীনন্দন প্রেসে,
শ্রীপুলিনবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২২ সাল।

মূল্য সাধারণ সংস্করণ ১৲ এক টাকা; কাপড়ে বাঁধাই ১।০ পাঁচ সিকা।

[*All Rights Reserved.*]

182. Ac. 915. 10.

সচিত্র

নব্য জাপান।

যশোহর-জেলার মথুরাপুর নিবাসি—

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই, (জাপান);
এম, আর, এ, এস, (লণ্ডন),

কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা
১৯৫।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীদেবকীনন্দন প্রেসে,
শ্রীপুলিনবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২২ সাল।

মূল্য সাধারণ সংস্করণ ১৲ এক টাকা ; কাপড়ে বাঁধাই ১।০ পাঁচ সিকা।

[*All Rights Reserved.*]

3 MAY. 11

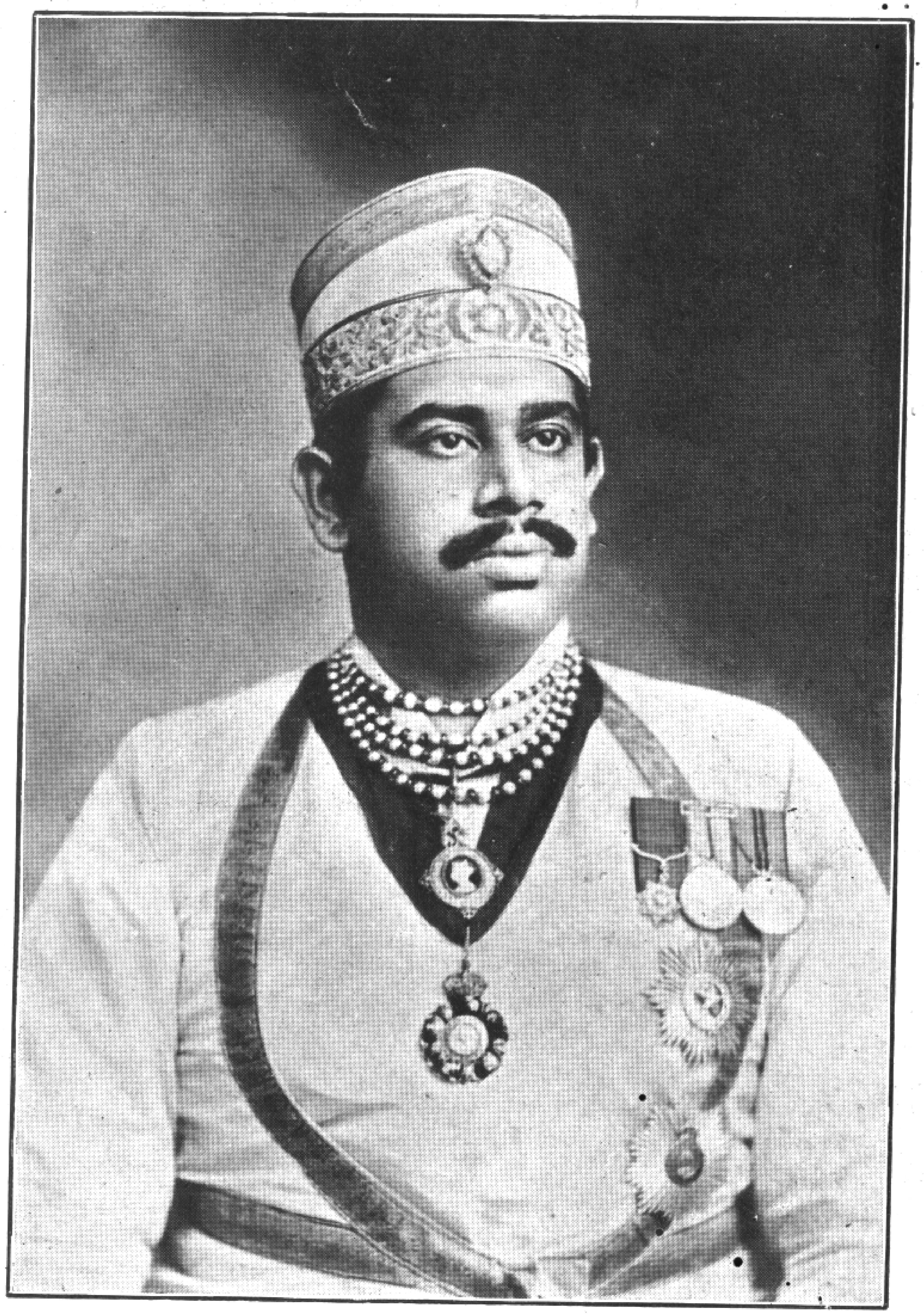

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর।

উৎসর্গ পত্র।

মহামহিম,

মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ
স্যর্ বিজয়চাঁদ্ মহাতাপ বাহাদুর কে,
সি, আই, ই; কে, সি, এস,
আই; এফ্, ও, এম্;
মহিমার্ণবেষু।

মহারাজাধিরাজ!

চিরদুঃখিনী বঙ্গভাষার সেবা-মন্দিরে আজ আপনাকে পাইয়া সাহিত্যসেবিগণ যেরূপ উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বিগত বর্দ্ধমান-সাহিত্য-সম্মিলনী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গ-ভাষার সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ সম্মিলন আর কখনও হয় নাই। এই স্মৃতিটুকু চির জাগ্রত রাখিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আপনার করকমলে অর্পণ করিতেছি। আপনি স্বয়ং সুলেখক, বহুদেশ পর্য্যটক্ এবং সর্ব্ববিষয়েই বঙ্গদেশের বরেণ্য। সুতরাং এই গ্রন্থখানি অকিঞ্চিৎকর হইলেও, ভরসা করি, আপনার নিকট উপেক্ষিত হইবে না। ইতি সন ১৩২২ সাল ৩রা অগ্রহায়ণ।

বিনয়াবনত—

নিবেদন।

ভগবানের কৃপায় বহু বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া সাত বৎসরের সঞ্চিত আশা আজ আংশিক ফলবতী হইল। মৎপ্রণীত জাপান-প্রবাসে উল্লিখিত 'অতীত জাপান' ও 'বর্ত্তমান জাপানে'র মধ্যে শেষোক্ত পুস্তকখানি 'নব্য-জাপান' নামে প্রকাশিত হইল। 'অতীত জাপান'ও 'সুপ্ত জাপান' আখ্যায়ে যন্ত্রস্থ।

এতদিন পুস্তক দুইখানি মুদ্রিত না হইবার বিশেষ কয়েকটী কারণ ছিল। সে বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে কতকগুলি অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে হয়; কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে এবং গ্রন্থকার, সাহিত্যসেবী ও বঙ্গভাষার পৃষ্ঠপোষকগণের জ্ঞাতার্থে তাহা এস্থলে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে ভুক্তভোগী গ্রন্থকারগণ সন্তুষ্ট এবং তথাকথিত সাহিত্যসেবিগণ রুষ্ট হইবেন, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকগণ আমাদের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে এখনও আমাদের দেশে বঙ্গভাষার পুস্তকাদি মূল্য দিয়া খরিদ করিবার লোক অতি বিরল। তবে নাটক, নভেল বা গল্পের বই হইলে কেহ কেহ কিছু অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশের জনসংখ্যা হিসাবে অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থ বিক্রীত হয় না বলিলেও চলে। আলমারীর শোভা বৃদ্ধি করিতে বা লাইব্রেরী সম্পূর্ণ করিবার জন্য এই শ্রেণীর পুস্তক অধিকাংশ স্থলেই গ্রন্থকারগণের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া লওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকারের বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত অনেকেই উহা বিনামূল্যে চাহিয়া বসেন। গ্রন্থকারগণ এইরূপে আপ্যায়িত হইয়া ক্ষতিগ্রস্থ হন, এবং অবশেষে পুস্তক-লেখা-ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়া তাহার উপযুক্ত পুরস্কার না পাইলে গ্রন্থকারগণ উৎসাহিত হইবেন কিসে? ভাল ভাল অনেক বিষয় এই জন্যই আমাদের দেশে অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইতেছে।

বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে লোক বিশেষের কথা ছাড়িয়া দিলেও জন-সাধারণের প্রদত্ত চাঁদা দ্বারা পরিচালিত লাইব্রেরী গুলি যখন বিনামূল্যে সামান্ত একখানি পুস্তকের প্রার্থী হয়, তখন দেশের অবস্থা মনে হইয়া ক্ষোভে ও দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যায়।

অসুস্থতা নিবন্ধন এই গ্রন্থখানি ছাপিবার সময় প্রুফ ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই। এজন্য যে সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে, আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা সংশোধন করিতে পারিব।

'নব্যজাপান' এবং 'সুপ্ত জাপান' লিখিবার জন্য আমাকে বহুসংখ্যক জাপানী বন্ধুবর্গের সাহায্য ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে হই-য়াছে। যাঁহারা জাপান সম্বন্ধে আরও সূক্ষ্মরূপে জানিতে চাহেন তাঁহারা ঐ পুস্তকগুলি পাঠ করিতে পারেন।

1. Tales of Old Japan by Mitford.
2. Capital of the Tycoons.
3. Feudal and Modern Japan.
4. Unbeaten Tracks of Japan.
5. The Soul and Spirit of Japan.
6. The Soul of the Far East by Lowell.
7. Bushido by Dr. Nitobe.
8. Glimpses of Unfamiliar Japan by Hearts.
9. Mikado's Empire by Griffis.
10. Things Japanese.
11. Japanese Girls and Women by Miss Bacon.
12. Young Japan by Black.
13. History of Japanese Literature.
14. Industries of Japan by Dr. Rein.
15. Transactions of the Asiatic Society.

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

মদীয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহোদয় প্রণীত "নব্য জাপান" প্রকাশিত হইল। ইহাতে জাপানবাসীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অতি সরল ভাষায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা জাপানে না যাইয়া তদ্দেশের বর্ত্তমান অভ্যুদয়ের কারণ জানিতে চাহেন তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করুন। ইহাতে অনাবশ্যক কথার অবতারণা না করিয়া গ্রন্থকার জাপানের জাতীয় শিক্ষা, বিবাহ-পদ্ধতি, স্ত্রী-চরিত্র, আধুনিক ধর্ম্ম, কৃষি ও শিল্প, স্বাস্থ্য ও গভর্ণমেণ্ট, শাসনপ্রণালী, আমোদ-প্রমোদ, সামরিক বিভাগ, জন্ম, অন্তিম-ক্রিয়া এবং আচার-ব্যবহার প্রভৃতি অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিশদ-ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। যাঁহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অভ্যুদয়শীল জাতি সমূহের চরিত্রগত উচ্চ আদর্শ বাঙ্গলা-সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত করিয়া দিতেছেন তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত সাহিত্যের যথার্থ পরিপোষক। এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মন্মথ বাবু বাঙ্গলা-সাহিত্যে, তথা বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় হইবেন সন্দেহ নাই।

মন্মথ বাবু ন্যূনাধিক তিন বৎসর কাল জাপানে বাস করিয়া ঐ দেশের রীতি-নীতি,ভাষা ও ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিয়াছেন।

তাঁহার পুস্তকে জাপানী শিল্পের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও অনেক গূঢ়তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা ও ভাব পরিমার্জ্জিত ও উন্নত। আশা করি, ইহা সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিবে।

মন্মথ বাবু তাঁহার জন্মভূমি যশোহর জেলায় চিরুণী-ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গলা দেশে জাপানী শিল্পের প্রচার করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর উক্ত কারখানা পরিদর্শন করিয়া পরম পরিতোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীসতিশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।
১৪-১১-১৫।

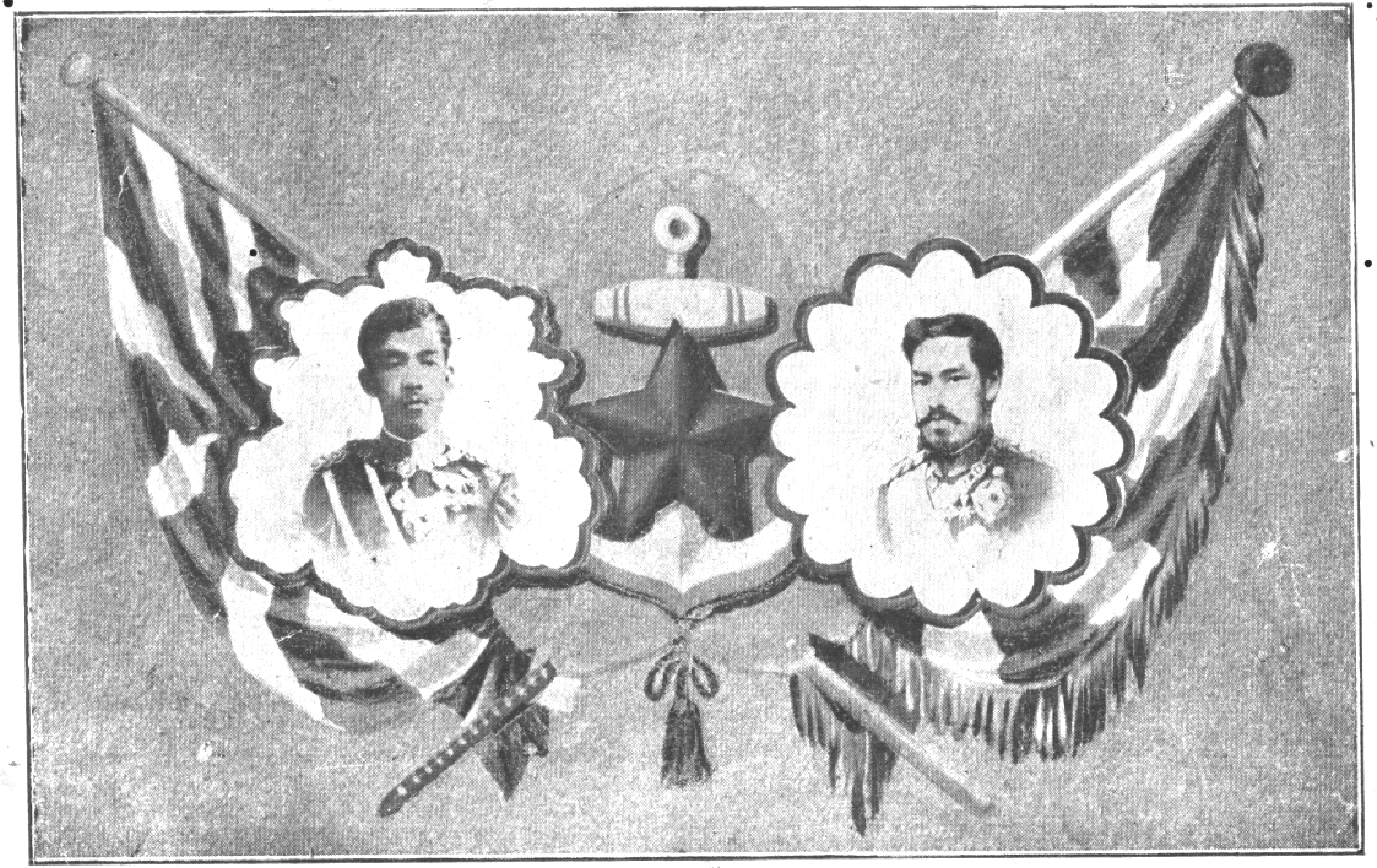

সম্রাট্ মাৎস্থহিতো এবং বর্ত্তমান মিকাদো।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

নব্য জাপান।

BENGAL LIB...
WRITERS BUILDINGS
... - 1916

জাপান—প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত চারিটী বৃহৎ এবং কতিপয় সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ জাপান নামে অভিহিত। ইহা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি এবং প্রায় ২০০০ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত। সমগ্র জাপান সাম্রাজ্যের পরিধি প্রায় ১৬৫০০০ বর্গমাইল এবং ইহার জনসংখ্যা প্রায় ৪৭০০০০০; সুতরাং পরিধি এবং জনসংখ্যায় ইহা প্রায় আমাদের মান্দ্রাজ বিভাগের সমান। তন্মধ্যে মাত্র এক ষষ্ঠাংশ কর্ষণোপযোগী।

স্বাভাবিক দৃশ্যসম্ভারে মনোরম দেশ জাপান ব্যতীত বুঝিবা আর কোথাও কোন দেশ নাই। সমগ্র দেশটী যেন একখানি ছবি! চারিদিকে সমুদ্র, মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এবং পাহাড়। এখানে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা অতিমাত্রায় থাকায় ভূমিকম্প প্রায় প্রত্যহই লাগিয়া আছে। ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎগীরণে প্রায়শঃ অনেক লোক জাপানে মরিয়া থাকে। ১৭০৭ সালে "ফুজিসান্" হইতে যে অগ্ন্যুৎগীরণ হয় তাহাতে নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পায় এবং তাহার শব্দ প্রায় ৬০ মাইল হইতে শ্রুত হইয়াছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর তোকিও সহরে এক অতি ভীষণ ভূমিকম্প হয়। এই সময় এক মাসের মধ্যে আশিটী কম্পন অনুভূত হয় এবং প্রায় দশ সহস্র লোকের জীবন নাশ হয় বলিয়া লিখিত আছে।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় জাপানীদেরও একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল।

একটী বৃহৎ মৎস্য পৃষ্ঠে জাপান স্থাপিত। সুতরাং মৎস্যটী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেই জাপানে ভূমিকম্প হইয়া থাকে, ইহাই জাপানীদের বিশ্বাস।

জাপানের পরিসর অতি কম হইলেও উহা অতি লম্বা দেশ। এই হেতু ইহার জলবায়ু সর্ব্বত্র সমান নহে। তবে মোটের উপর জাপান শীতপ্রধান দেশ এবং তথাকার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর।

খনিজ পদার্থের মধ্যে জাপানে লৌহ এবং কয়লার প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

ব্যাঘ্র অথবা বন্য বিড়াল জাতীয় কোন জন্তু জাপানে আদৌ নাই। বন্য শূকর এবং ভল্লূক প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গাধা, ছাগল, ভেড়া নাই বলিলেও চলে। সামুদ্রিক মৎস্য জাপানে খুব পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

জাপানে এক প্রকার মাকড়সা আছে, তাহার হাত পা প্রায় চারি ফুট লম্বা। জাপানে তুঁত পোকার চাষ খুব বেশী পরিমাণে করা হইয়া থাকে।বলা বাহুল্য জাপান আজ কাল জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় রেশম প্রস্তুতকারী দেশ।

জাপানী শিশু।

জাপানী স্ত্রী গর্ভবতী হইলে পঞ্চম মাসে শুভদিন দেখিয়া তাহার কটীদেশে একটী লাল এবং শ্বেতবর্ণের রেশমের কোমর বন্ধ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। স্বামীর 'কিমোনো'র (জাপানিদের পরিধেয় বস্ত্র) বাম পার্শ্বস্থ 'সোদে'(Sleeve) হইতে এই কোমর বন্ধ প্রস্তুত করিয়া স্ত্রীর কিমোনের দক্ষিণ দিকে সংলগ্ন করা হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে এই কোমর বন্ধটীর শ্বেতভাগ নীলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া ইহা বিচিত্ররূপে চিত্রিত করা হয় এবং ইহা দ্বারাই সদ্যোজাত সন্তানের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই কোমরবন্ধটী রঞ্জিত করে, সে সুরা ও অন্যান্য বস্তু উপঢৌকন স্বরূপ পাইয়া থাকে। অনেক সময়ে অন্য স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত কোমর বন্ধ স্বামী প্রদত্ত কোমর বন্ধের সহিত ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত কোমরবন্ধ ব্যবহার

দশমবর্ষীয়া ছাত্রী 'ও হানা সান্'।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

করিয়া সেই স্ত্রীলোকটী যেমন নির্ব্বিঘ্নে ও সহজে প্রসব করিয়াছিলেন, ইনিও যেন সেইরূপ অনায়াসে প্রসব করিতে পারেন। যে স্ত্রীলোকটীর কোমর বন্ধ এইরূপে ব্যবহৃত হয়, তাঁহার সহিত প্রসবান্তে উপহারাদি আদান প্রদান হয়।

শিশু জন্মিবার পূর্ব্বেই অন্ততঃ বারো জোড়া পরিচ্ছদ তাহার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখিবার নিয়ম। ইহার মধ্যে ছয় জোড়া রেশম নির্ম্মিত এবং অপরগুলি সূতীর। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাহাকে গরম জলে ধৌত করিয়া রুমাল দ্বারা তাহার গাত্র পুছিয়া দেওয়া হয়।

অনন্তর ভূমিষ্ঠ হইবার ৭৫ কিংবা ১২০ দিনের দিন নবজাত শিশুর সমুদয় পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে হয়। জাপানীদের মতে এই দিনটী অতি প্রশস্ত এবং পবিত্র। পূর্ব্বে এই সময়ে শিশুকে নানাপ্রকার রেশমের বস্ত্র পরিধান করিতে হইত, কিন্তু ইহাতে শিশুর স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় আধুনিক জাপানীরা তৎপরিবর্ত্তে সুন্দর সূতির বস্ত্র পরাইয়া থাকেন।

১২০ দিনের পর শিশুর অন্নপ্রাশন হয়। এই উপলক্ষে আর পৃথক করিয়া শুভদিন দেখিতে হয় না; কারণ শিশুর জন্ম হইতেই এই দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অন্নপ্রাশন ক্রিয়া—জাপানে নিম্নলিখিত প্রকারে সম্পাদিত হয়। শিশুকে তাহার অভিভাবক, পরিবারস্থ একজনের বাম হাঁটুর উপরে স্থাপিত করিয়া ছোট একখানি টেবিলের এক কোণে প্রসাদ এবং বিপরীত কোণে পাঁচখানি অন্ন পিষ্টক রাখিয়া দেন। অনন্তর 'চপষ্টীক' দ্বারা (জাপানীরা খাদ্য দ্রব্য হস্তদ্বারা স্পর্শ না করিয়া দুইটী কাটির সাহায্যে উহা মুখে তুলিয়া থাকেন) বারেক ভাতস্পর্শ করিয়া অতি সন্তর্পণে উহা শিশুটীর মুখের নিকট ধারণ করা হইলে পর অন্ন-পিষ্টকও ঐরূপে তাহার মুখে ছোঁয়ান হয়। এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে জাপানে অন্ন-প্রাশনের ভাত আমাদের হিন্দুদিগের ন্যায় প্রথমতঃ দেবতার দ্বারা উচ্ছিষ্ট করাইয়া লওয়া হয়।

ইহার পর শিশুটীকে পুনরায় অভিভাবকের নিকট রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি তিন পেয়ালা সুরা স্বয়ং পান করিয়া সুরাপূর্ণ দুইটী পাত্র শিশুর মুখের কাছে ধারণ করেন। এই সময়ে তিনি শিশুটীকে কিছু 'আশীর্ব্বাদী' দিয়া থাকেন। এইরূপে আর একবার সুরাপানের পর শিশুকে একটী শুষ্ক মৎস্য উপহার দেওয়া হয়। এইবার আবার পূর্ব্ববৎ সুরাপান চলিতে থাকে। অনন্তর সেখানে নানাপ্রকার মৎস্য আনীত হইলে আবার সুরাদেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ হয় এবং সেই সঙ্গে একটী প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হয়। শিশুটী কন্যা হইলে উল্লিখিত সমস্ত কার্য্য পরিবারস্থ একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

শিশুর বয়স তিন বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে মাথা মুণ্ডিত করা হয়; পরে তাহার মস্তকের দুই পার্শ্বে এবং পশ্চাৎ ভাগে অল্প অল্প চুল রাখিয়া বাকি সমস্ত ক্ষুর দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হয়। এই কেশকর্ত্তন উপলক্ষে নিম্নলিখিত সাতটি দ্রব্য এবং একজন লোকের আবশ্যক হয়। (১) চিরুণী (২) কাঁচি, (৩) কাগজের সূতা, (৪) সূতা, (৫) উল, (৬) ধানের গাছ সাত গাছি, এবং (৭) শুষ্ক মৎস্য (যাহা শিশুটী অন্নপ্রাশনের সময় উপহার পায়)। প্রথমতঃ শিশুটীর মস্তকের বামদিক হইতে কাঁচি দ্বারা তিনবার, পরে দক্ষিণ দিক হইতে তিনবার এবং সর্ব্বশেষে পশ্চাদ্ভাগ হইতে তিনবার চুল কাটিয়া উল দ্বারা তাহার মস্তক ঢাকিয়া রাখা হয়। উল শিশুর পশ্চাদ্দিক হইতে গল দেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। ধানের গাছগুলি এবং শুষ্ক মৎস্যের কিয়দংশ কাগজের সূতা দ্বারা ঐ বিলম্বিত উলের দুই কোণে এরূপভাবে সংলগ্ন করা হয়, যেন উহা কবরী-বন্ধনের ন্যায় দেখা যায়। সূতা গাছি এই কাগজের সূতার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সুরাপান অন্নপ্রাশনের সময় যে প্রণালীতে হয় এখনও সেইরূপ।

শিশুটী কন্যা হইলে চুল প্রথমতঃ বামদিক হইতে না কাটিয়া দক্ষিণ দিক

হইতে কাটা হয় এবং উল্লিখিত সমুদয় ক্রিয়া পুরুষের পরিবর্ত্তে একজন স্ত্রী-লোকের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

শিশুর বয়স তিন বৎসর এগার মাস পাঁচ দিন হইলে তাহাকে 'সামুরাই' এর 'হাকামা' (এক প্রকার ঢিলে পাজামা বিশেষ) পরাইয়া দেওয়া হয়। এই সময়েও একজন লোকের দরকার হয়। ইনি শিশুটীকে এই উপলক্ষে যে পরিচ্ছদ দান করেন তাহার উপর বক, কচ্ছপ বাঁশ এবং ফার (fir) বৃক্ষের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। ইহার অর্থ এই যে, উক্ত শিশুটী যেন বক এবং কচ্ছপের ন্যায় দীর্ঘায়ু হয়। জাপানীদের বিশ্বাস যে বক সহস্র বৎসর এবং কচ্ছপ দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ফার বৃক্ষের বর্ণ সর্ব্বদাই সবুজ। ইহাতে এই বুঝায় যে, শিশুটীর মন যেন চিরকাল নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক থাকে। বাঁশ সোজা এবং লম্বা ; সুতরাং ইহা দ্বারা এই বুঝায় যে শিশুর মন যেন বাঁশের ন্যায় সরল ও উচ্চ হয়। এই সময়ে শিশুটী একখানি ছোরা প্রাপ্ত হয়। সুরা পান পূর্ব্বের ন্যায় এখনও হইয়া থাকে। এই সময়ে এবং কেশ কর্ত্তনের সময় শিশুটীকে শুভদিকে মুখ করিয়া বসিতে হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শিশুর মস্তকের তিন যায়গায় চুল ছাটিয়া রাখা হয়। এখন দেখা যাউক উহা কিরূপ ভাবে সংরক্ষিত হয়। অনন্তর কেশগুচ্ছ ক্রমশঃ বড় হইয়া পড়িলে সম্মুখের উভয় পার্শ্বের চুল পূর্ব্ববৎ রাখিয়া মধ্যস্থলের চুল কাটিতে দেখা যায়। দশবৎসর বয়ঃক্রম হইলে সাধারণ জাপানীদের ন্যায় কেশ কর্ত্তন করিবার নিয়ম। পুরাকালে মধ্যস্থলের কেশকর্ত্তনের সময়ও একটী উৎসবের আয়োজন করিয়া মাথায় টুপি দেওয়া হইত। এক্ষণে এই উৎসবটী অতীতের গর্ভে নিহিত হইয়াছে।

শিশুর নামকরণ।—ভূমিষ্ঠ হইবার সাতদিন পরেই মাতা পিতা এবং আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছামত শিশুকে একটী নাম দেওয়া হয়। জাপানীদের নামকরণে একটু বিশেষত্ব আছে। সকল জাপানীরই পারিবারিক

উপাধি কোনও না কোনও গ্রাম, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ কিংবা অন্য কোনও স্বভাব জাত জিনিস হইতে গৃহীত হইয়াছে। মেয়েদের নাম ফুল, ঋতু কিংবা অন্য কোনও মনোজ্ঞ প্রাকৃতিক বস্তু হইতে গৃহীত হয়।

অনন্তর বালকের বয়স পনর বৎসর হইলে পর যখন তাহার মনুষ্যোচিত বুদ্ধি এবং চতুরতার পরিচয় পাওয়া যায়, তখন একটি শুভদিন দেখিয়া তাহার প্রকৃত নামকরণ হয়। এই সময় হইতে তাহাকে পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করা হয়।

প্রকৃত নামকরণ জনৈক চরিত্রবান্ মহাপুরুষের দ্বারা সংসাধিত হয়। এই নামকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বালকেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় 'কিমোনো' পরিধান করে, কারণ নামকরণ না হইলে বালকেরা পুরুষের 'কিমোনো' পরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় না। বলা বাহুল্য এই উপলক্ষেও সুরাপান নিয়মিতরূপে চলিয়া থাকে। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত সেই ব্যক্তি যুবকের অজ্ঞাতসারে একগুচ্ছ কেশকর্ত্তন করিয়া উহা তাহার অভিভাবকের হস্তে প্রদান করেন। এই কেশগুচ্ছ একখানি কাগজে মুড়িয়া দেবতাগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া রাখা হয়। এই চুলগুলি কেহ কেহ সেই বালকের মৃত্যুর পর একসঙ্গে সমাধি দিয়া থাকেন।

জাতীয় শিক্ষা।

*বর্ত্তমান সম্রাট্ সিংহাসন আরোহণ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই শিক্ষার ফলে জাপানে নবজীবনের উন্মেষ হয়। তৎপরে স্বদেশভক্ত জাপানী নেতৃবর্গের আন্তরিক চেষ্টায় এবং যত্নে জন-

* এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি মহাত্মা মিকাদো মাৎসুহিতোর জীবিতাবস্থায় এবং আমার জাপানপ্রবাসকালে লিখিত; সুতরাং বর্ত্তমানমিকাদো বলিলে পুণ্যাত্মা "মাৎসুহিতো"কেই বুঝিতে হইবে।

সাধারণের মধ্যে স্বদেশানুরাগের বীজ বপন করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে একতার উপকারিতাও জাপানীরা অনুভব করিতে লাগিলেন। সকলেরই উদ্দেশ্য এক হইলে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধু হইলে, জনসাধারণ যে স্বতঃই একতার সুদৃঢ়-সূত্রে আবদ্ধ হয়, জাপানী জীবন তাহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয়।

জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের মধ্যে কিরূপে ঐকতার সৃষ্টি হইল ক্রমশঃ তাহা বলিতেছি। সর্ব্বপ্রথম জাপান গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক নগরে আদর্শ পাঠশালা খুলিয়া রাজ্যস্থিত সকলকে রাজবিধানদ্বারা উক্ত পাঠশালাসমূহে বালকবালিকাদিগকে পাঠাইতে বাধ্য করিলেন। গ্রামবাসীদের পক্ষে বালিকাদিগকে নগরে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া অসুবিধা-জনক হওয়ায় ক্রমশঃ তাঁহারা স্ব স্ব গ্রামে পাঠশালা স্থাপিত করিলেন। বলা বাহুল্য গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত পাঠশালাগুলিকে উপযুক্ত সাহায্যদানে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই জাপানের প্রত্যেক গ্রামে জাতীয় জীবন-গঠনের উপযোগিনী শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। শুধু পাঠশালা স্থাপন করিয়াই উন্নতশীল জাপানীরা নিরস্ত হইলেন না। অনন্তর তথায় কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহার আলোচনা হইতে লাগিল। পরে স্থির হইল যে Kindergarten System সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সুতরাং সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগকে উক্ত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়াই ব্যবস্থা হইল। এক্ষণে কিরূপ পুস্তক নির্ব্বাচিত হইল পাঠকবর্গ তাহা একবার দেখুন! ভারতবর্ষের পাঠশালাসমূহে যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হয়, তাহার অধিকাংশ পুস্তকই কাল্পনিক গল্পে পরিপূর্ণ। সত্য ঘটনার ছায়ামাত্র প্রায়শঃ তাহাতে থাকে না। কল্পনাশক্তি (power of imagination) প্রকটিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই সরলমতি বালকবালিকা-দিগকে অলীক গল্প শিক্ষা দেওয়ায় তাহাদের কোন উপকারও হয় না, বরং

বিধি। পরে গৃহে ভারতীয় সন্তানগণ কিরূপ শিক্ষা পাইয়া থাকে তাহাও সকলেই বিদিত আছেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মাতা—স্ত্রী-শিক্ষা বহুল পরিমাণে প্রচলিত না হওয়ায় ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছেন। সন্তানগণকে শিক্ষা দিবার পক্ষে তাঁহারা নিতান্ত অনুপযুক্তা। জগতের সমস্ত সভ্য দেশেই শৈশবাবস্থার বালক বালিকাগণের শিক্ষার ভার মাতার উপরে ন্যস্ত হইয়া থাকে। কারণ ঐ সময়ে শিশুগণ সর্ব্বতোভাবে মাতৃবশে থাকে। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সংসর্গে নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাতাই শিশুর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেন। এক্ষণে সেই মাতা স্বয়ং অশিক্ষিতা হইলে, শিশুর শিক্ষা কিরূপে হইতে পারে তাহা ভারতবর্ষের ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। আমরা শৈশবাবস্থায় মাতা, খুড়ী, জেঠী, পিসী ইত্যাদির মুখ হইতে ভূত ও প্রেতের গল্পই শুনিয়া থাকি। কয়জন শিশুর ভাগ্যে তাঁহাদের মুখ হইতে শিবাজীর কাহিনী কিংবা তদ্রূপ অন্য কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা শ্রুত হইয়া থাকে? কয়জন মাতা নিজ নিজ শিশুকে আর্য্যগণের কীর্ত্তিসমূহ শিখান? জগতের সমস্ত জাতিই নিজ নিজ ঐতিহাসিক কীর্ত্তিসমূহ সমুজ্জ্বল রাখিতে ব্যস্ত; কেবল আমরাই ইচ্ছাক্রমে ভুলিতেছি। এই খানেই আমাদের পার্থক্য। কতজনই কত পুস্তক লিখিয়াছেন, কিন্তু আর্য্যগণের কীর্ত্তিসমূহ সরলভাষায় লিখিয়া শিশুগণের পাঠোপযোগী করিতে ক'জন চেষ্টা করিয়াছেন?

জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ অতি সরল ভাষায় লিখিত। উহাতে নানারূপ উপদেশপূর্ণ প্রকৃত ঘটনাবলীর সমাবেশ থাকে। পুরাকালে যে সমস্ত কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষ স্বদেশভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কার্য্যপ্রণালী অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়া থাকে। পুস্তকে

সমস্ত গল্পের আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত থাকে, সুতরাং এ সমস্ত গল্প বিস্তৃতভাবে মাতাকেই বলিতে হয়। বিদ্যালয়ে যে সমস্ত মহাত্মার জীবনী পাঠ করে, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মাতৃমুখ হইতে তাহা অতি বিস্তৃতভাবে জাপানী শিশুগণ শ্রবণ করিয়া থাকে। মাতা স্বয়ং সুশিক্ষিতা হওয়ায় সন্তানের আগ্রহ বৃদ্ধি করিবার জন্য গল্পগুলি বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া বলেন। ইহাতে বালকবালিকাগণের গল্প শুনিবার আগ্রহ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে, এবং তৎসঙ্গে জাতীয় ঐতিহাসিক পুরুষগণের কীর্ত্তিসমূহও হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকে। এইরূপে বাল্যকাল হইতে জাপানী শিশুগণ জাতীয় গৌরব শিক্ষা করিতে থাকে।

শিক্ষাপ্রণালী—বিদ্যালয়গুলিতে বালকবালিকাগণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ এবং গীতবাদ্যের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তথায় শিক্ষকগণ ছাত্রবৃন্দকে নানাপ্রকার জাতীয় সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন। পাঠশালার ছুটীর পর ছাত্রগণ যখন Uniform ('হাকামা') পরিধান করিয়া দলে দলে গান করিতে করিতে বিদ্যালয় হইতে বাহির হইতে থাকে, তখনকার দৃশ্য কি সুখকর! ২।৩ জন ছাত্র একত্র হইলেই গান করিতে থাকে, তৎপরে পথিস্থ সকল বালক বালিকাই অসঙ্কোচভাবে তাহাদের সহিত যোগ দান করে। এইরূপে শিশুগণ পথের লোকদিগকে মাতাইয়া সুমধুর কণ্ঠে গান করিতে করিতে গন্তব্যস্থানে যাইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রতি সপ্তাহে শিক্ষকগণ ছাত্রবৃন্দকে লইয়া ভ্রমণে (Excursion) বাহির হন। এই সময়ে ছাত্রগণ প্রায়শঃ জাতীয় পতাকা লইয়া পর্ব্বতোপরি কিংবা তাহার পাদদেশে গমন করিয়া Mimic war অর্থাৎ সমর ক্রীড়া করিয়া থাকে। বালকগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকে এবং শিক্ষকগণ একপার্শ্বে বসিয়া তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন।

বালকদিগকে তাহা বুঝাইয়া দেন। বালকগণের মধ্যে কেহ সৈন্যাধ্যক্ষ, কেহ রণবাদ্যকর এবং অন্যান্য সকলে সৈন্য সাজিয়া যুদ্ধ করিতে থাকে। এই সমস্ত দৃশ্য দেখিয়া কাহার মনে আনন্দ না হয়? যে সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত হয় নাই, তাহারাও তথায় যাইবার জন্য ব্যস্ত। পাঠশালার ছাত্রগণ গৃহাপেক্ষা বিদ্যালয়ই ভালবাসে এবং তথায় যাইতে পারিলেই সন্তুষ্ট। যতদিন আমাদের দেশীয় পাঠশালাগুলিও বালকবালিকাগণের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত না হইবে, ততদিন তাহাদের মনপ্রাণ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। স্বেচ্ছাক্রমে পাঠ এবং বাধ্য হইয়া গুরুমহাশয়ের ভয়ে পড়া এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। আমাদের দেশেই বালকবালিকাগণ বিদ্যালয়কে যমালয় অপেক্ষাও অধিক ভয় করে। তাহাদের পক্ষে এরূপ করাই স্বাভাবিক, কারণ অধিকাংশ গুরুমহাশয়ই যমাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। এতাদৃশ গুরুমহাশয়গণের হস্তে পড়িয়া ছাত্রগণ তাহাদের স্বাভাবিক নির্ভীকতাটুকুও হারাইতে থাকে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

জাপানী শিশুদিগকে প্রাকৃতিক সাহসিকতা এবং আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকগণ এক অপূর্ব্ব নূতন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। বালক বালিকাগণের কোনও দোষের জন্য কখনও ভয় প্রদর্শন কিংবা প্রহার করা হয় না। শাস্তিস্বরূপ ছুটীর পর এক আধ ঘণ্টা পাঠশালায় আটকাইয়া রাখিলেই জাপশিশুগণ শুধরাইয়া যায়। অন্যান্য ছাত্রগণ দলে দলে গান ধরিয়া যখন বিদ্যালয়ের বাহির হইতে থাকে তখন বদ্ধ বালকটীর কিংবা বালিকার মনে যে কিরূপ অনুতাপ ও ঘৃণা হয় তাহা বোধ হয় শত শত বেত্রাঘাত এবং পঞ্চাশ গণ্ডা গালাগালিতেও হয় না। কোমলপ্রাণ শিশুসন্তানদিগকে জাপানীদের প্রথানুসারে শাস্তি দিলেই ভাল হয় না কি?

আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান—এখন দেখা যাউক, জাপশিশুগণকে

কিরূপে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। যদি কোনও বালক তাহার সহপাঠী কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া শিক্ষকের নিকট প্রতীকারের জন্য আবেদন করে, তাহা হইলে শিক্ষক মহাশয় অপরাধীকে কিছু না বলিয়া আবেদনকারীকে সম্বোধন করিয়া "তুমি জীবিত মনুষ্য নও। তোমার ন্যায় কাপুরুষ জগতে দ্বিতীয় নাই। তুমি তোমার পিতৃবংশে কলঙ্ক দিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, নচেৎ আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান তোমার নাই কেন?" ইত্যাদি তিরস্কার মিশ্রিত বাক্য প্রয়োগান্তে বলিতে থাকেন :—

"তোমার উচিত ছিল তাহাকে স্বয়ং মারিয়া পরে আমার নিকট আসিয়া নালিশ করা। প্রহার খাইয়া কাপুরুষের মত আমার নিকট প্রতীকারে জন্য প্রার্থনা করা কোনও মতে সমীচীন নহে। এরূপ আচরণ তোমার মাতা পিতাকে মর্ম্মাহত করিবে সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহারা তোমার আচরণে বিশেষ লজ্জিত হইবেন। আশা করি আর কখনও তুমি এরূপ করিবে না। যে তোমাকে অপমান কিংবা প্রহার করিবে তুমি তদ্দণ্ডে তাহার প্রতীকার স্বহস্তে করিবে নচেৎ মনুষ্য সমাজে হেয় হইতে হইবে।"

একদা একটী পাঠশালা পরিদর্শন করিতে গিয়া আমি জনৈক ছাত্রকে উল্লিখিত কারণে তিরস্কৃত হইতে দেখিয়াছি।

হস্তাক্ষর ও চিত্রাঙ্কন—জাপানী শিশুগণের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। জাপানী ভাষার বর্ণ (letters) অসংখ্য। ঐ বর্ণসমূহ খাঁকের কলম কিংবা পেন্ দ্বারা লেখা যায় না। জাপানীরা তুলি দ্বারা উহা লিখিয়া থাকেন। অতি বাল্যকাল হইতে পাঠশালায় তুলি ধরিয়া লিখিতে হয় বলিয়া প্রায় সকল জাপানীর হস্তই তুলি ব্যবহারে বেশ অভ্যস্ত। বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃন্দকে তুলিদ্বারা কেবল যে অক্ষর লিখিতে হয় তাহা নহে, অনেক সময়ে ছাত্রগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া উহাদ্বারা নানাপ্রকার চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকে এবং সেই সমস্ত চিত্র সম্পূর্ণ করিতে শিক্ষকগণ

সহায়তা করিয়া থাকেন। চিত্রাঙ্কনে মন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইলে পরে, বালকগণকে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কিত করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সমস্ত কারণে জাপানের স্ত্রী পুরুষ সকলেই চিত্রাঙ্কন করিতে পারেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে *'ফুজি' নামক পর্ব্বতটি জাপানীদের সর্ব্বপেক্ষা প্রিয় বস্তু। বালক বালিকাগণ সর্ব্বপ্রথম এই পর্ব্বতটিকে চিত্রিত করিতে শিক্ষা করিয়া থাকে।

জাপানী বালক বালিকাগণের চিত্রশিক্ষা সম্বন্ধে লিখিতে আমার মনে একটি ঘটনার স্মৃতি উদয় হইল। এটী আমার মধ্য ইংরাজী স্কুলে পঠ্যাবস্থায় ঘটিয়াছিল। ভারতীয় ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেরই অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিয়া থাকে বলিয়াই এস্থলে তাহার আবৃত্তি করিলাম। পাঠকবর্গ, আপনাদের বহুমূল্য সময় এইরূপে হরণ করিতেছি বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

বাল্যকালে ছবি আঁকার রোগ আমার অতি প্রবল ছিল। বালকগণের পক্ষে 'ছবি আঁকা' অদ্যাপি আমাদের দেশে দোষের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু অন্যান্য সভ্য দেশের বালকগণকে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। এই 'ছবি আঁকার রোগের' জন্য আমি অনেকবার পাঠশালায় এবং গৃহে তাড়িত ও ভর্ৎসিত হইয়াছি। একদা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়ের

* 'ফুজি সান্' জাপানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। উহার শিখরদেশ সর্ব্বদাই তুষারাবৃত থাকে। এই পর্ব্বতটী উচ্চে জাপান সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় হইলেও উহার রমণীয় দৃশ্যের জন্য জাপানীরা উহাকে দেবতা জ্ঞানে পুজা করিয়া থাকেন। কবিগণ এই পর্ব্বত প্রবরকে স্তব ও বন্দনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; চিত্রকারগণ উহার আড়ম্বরশূন্য তুষারাবৃত দেহ অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদের তুলিকা সার্থক করিয়াছেন। আবার পাঠশালার ছাত্রগণ বর্ণপরিচয়ের পুর্ব্বে উহার সহিত পরিচিত হইয়া বিমল আনন্দ অনুভব করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আদর জাপানীরাই জানেন! ভারতবর্ষের হিমালয় পর্ব্বত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়; কিন্তু আমরা উহার কি আদর করিয়া থাকি?

'ও হানা সানে'র স্বহস্ত অঙ্কিত চিত্র।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

সুগোল বেত্রও আমার হস্তে স্নেহভরে পতিত হইয়াছিল। সেই অবধি ছবি আঁকার রোগ হইতে আমি মুক্তি পাইয়াছি। জাপানের শিশুগণকে চিত্রাঙ্কনে যেরূপ উৎসাহিত করা হয়, তদ্দর্শনে আমার সেই পূর্ব্বস্মৃতি মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তাই কয়েকটী কথা বলিয়া ফেলিলাম। মধ্য ইংরাজী স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে পাঠকালে একদিন আমি একটী ঘোড়া আঁকিতেছিলাম। চিত্রটী সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তৎপ্রতি শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টি পড়িল, তিনি উহা আমার হস্ত হইতে ছিনিয়া লইয়া বেত্রোত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন —"আর কখনও ছবি আঁক্‌বি? হাত পাত দেখি, কোন্ হাত দিয়া এই ছবি আঁকা হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি অগত্যা দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলাম, অমনি মুহূর্ত্তমধ্যে সপ্ সপ্ করিয়া বেত্রাগ্র আমার হস্তে পড়িতে লাগিল। অনন্যোপায় দেখিয়া আর কখনও ছবি আঁকিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা ভারতবর্ষে থাকিতে আর কখনও ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হয় নাই। জাপানে অবস্থানকালে তাহা ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইয়াছিল বটে; কিন্তু এখন আর হাতে সেরূপ টিপ আসে না। হাত যেন অপেক্ষাকৃত শক্ত হইয়া আমার অবাধ্য হইয়া গিয়াছে। শিক্ষক মহাশয়ের অবৈধ বিচারে আমার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার জন্য তিনি দায়ী নন কি? তিনি যদি আর কাহারও প্রতি ঐরূপ অবিচার না করেন তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইব। ভারতীয় শিক্ষকবর্গকে চিত্রাঙ্কনের উপকারিতা বুঝাইয়া না দিলে, তাঁহারা কোনও মতে অবিচার করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। সহৃদয় পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় আমার ন্যায় অবিচারে দণ্ডিত এবং লাঞ্ছিত হইয়াছেন।

জাপানীদের জাতীয় শিক্ষা-সম্বন্ধে আর একটু বলিবার আছে। প্রতি পল্লীতে পাঠশালা স্থাপিত হইলে জনসাধারণের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা বেশ সহজসাধ্য হইয়া গেল। ক্রমে শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ বাড়িতে

লাগিল। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ মানব-হৃদয় সর্ব্বদাই জ্ঞান-লাভের জন্য ব্যস্ত। ভালই হউক আর মন্দই হউক আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে কিছু না কিছু শিখিতেছি। সম্মুখে ভাল আদর্শ থাকিলে, লোক শিক্ষাও সৎপথে অগ্রসর হয়; নচেৎ কুপথগামী হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে। সৌভাগ্যক্রমে জাপানীরা ভাল আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। আমেরিকা এবং ইউ-রোপের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত প্রদেশ সমূহকেই জাপানীরা আদর্শ-স্বরূপ ধরিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টায় সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

জ্ঞানতৃষ্ণা জাপানীদের মধ্যে যেমন বলবতী হইতে লাগিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে শত শত সংবাদ পত্র সরলভাষায় লিখিত হইয়া প্রকাশিত এবং প্রচারিত হইতে লাগিল। সংবাদপত্রই লোকশিক্ষার প্রধান উপায়। উহার সাহায্যে লোকশিক্ষা যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র আর কোনও উপায়ে হইতে পারে না। অন্যান্য দেশের তুলনায় নিজেদের দেশের অবস্থা বুঝিতে হইলে সংবাদ পত্রই একমাত্র উপায়। যে দেশ যত উন্নত, সে দেশে সংবাদ পত্রের সংখ্যা তত অধিক।

সংবাদপত্র—জাপান বঙ্গদেশ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, প্রায় মান্দ্রাজের সমান। কিন্তু এখানে সংবাদপত্রের সংখ্যা ১২০০ শতেরও উপর হইবে। এখানকার কুলি, গাড়োয়ান, এবং তাহাদের স্ত্রী কন্যাগণও সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে। কুলি এবং গাড়োয়ানগণ যখনই অবসর পায়, অমনি সংবাদ-পত্র খুলিয়া পড়িতে বসে। কি সুন্দর দৃশ্য!

একতা—জাপানে কিরূপভাবে একতার সৃষ্টি হইল, তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিয়াছেন। সংবাদপত্রই একতা সাধনের প্রধান অস্ত্র, তাহা বলাই বাহুল্য। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ জাতীয় অভাব এবং আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টাক্ষরে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেয়। এইরূপে ক্রমে

ক্রমে জনসাধারণের মত এবং সংবাদপত্রের মত একই হইয়া যায়। সকলের মত এক হইলেই তাহাদের মধ্যে যে একতার সৃষ্টি হয় তাহা দুর্ভেদ্য।

শিক্ষার্থে বিদেশগমন—এইরূপে জাপানীদের জাতীয় লক্ষ্য এক হইলে পরে তাহারা * প্রয়োজনানুসারে সমাজ সংস্কার করিয়া দলে দলে আমেরিকায় এবং ইউরোপে বিদ্যাশিক্ষার্থে গমন করিতে লাগিল। অধিকাংশ যুবকই আমেরিকায় যাইতে লাগিল; কারণ, সেখানে স্বাবলম্বী হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করা যায়। এখনও পর্য্যন্ত অসংখ্য জাপানী-যুবক শিক্ষার্থে আমেরিকায় যাইতেছে। তাহারা তথায় দিবসে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা দৈনিক জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া নৈশবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে। শিক্ষাবস্থায় অতি হীন কার্য্য করিতে জাপানী যুবকেরা কুণ্ঠিত নহে। এই সদ্‌গুণটী আমাদের দেশে অবশ্য অনুকরণীয়।

জাপানে যেরূপ অল্পায়াসে জাতীয় শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে আমাদের দেশে সেরূপ হওয়া অসম্ভব। কারণ প্রথমতঃ আমাদের গভর্ণমেণ্ট লোকশিক্ষার প্রতি এখন পর্য্যন্ত সেরূপ আন্তরিক ঝোঁক দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ আমরা দৃঢ়সংকল্প হইয়া অদ্যাপি কোনও দেশকে আদর্শ স্বরূপ ধরিতে পারি নাই। তৃতীয়তঃ আমাদের দেশে স্বার্থত্যাগী লোক খুব কমই আছেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পতিতাবস্থায় এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা আশানুরূপ না হওয়া পর্য্যন্ত জাতীয় জীবন, কখনই গঠিত হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য। বর্ত্তমান যুবকবৃন্দের যেরূপ সুমতি দেখা যায়, তাহাতে খুবই আশা হয় যে, শীঘ্রই এই শ্রেণীর লোক প্রয়োজন মত পাওয়া যাইবে। ভগবান্ আমার এই আশা অবিলম্বে পূর্ণ করুন!

---

* চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীরাও আমাদের ন্যায় সামাজিক কুপ্রথার বশীভূত হইয়া বিদেশে গমন করিত না।

আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের পথে যেগুলি প্রধান অন্তরায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি; এক্ষণে তাহাদের কোনও প্রতিকার আছে কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য। ভারতবর্ষের ন্যায় স্থানে আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীতও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর। কারণ ভারতবাসীরা গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা সমাজকে অধিকতর ভয় এবং সম্মান করেন। ইহা আমাদের আভ্যন্তরীণ (internal) গভর্ণমেণ্ট। ইহা প্রবলতর না হইলে এতদ্দিন আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব একেবারেই লোপ পাইত। সুতরাং যাহাতে আমাদের সমাজের বন্ধনগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতি আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে যে সমস্ত কুপ্রথা সামাজিক রীতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সামাজিক কুপ্রথার বশীভূত হইয়া জাপানীরাও বিদেশ গমন করিতেন না। যাঁহারা সামাজিক নিষেধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বিদেশে যাইতেন, অধিকাংশস্থলেই তাঁহাদিগকে হত্যা করা হইত। অতএব দেখুন জাপানের অবস্থা আমাদের অপেক্ষাও কত গুরুতর ছিল। প্রিন্স ইতো (Prince Ito) বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য দুইবার ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল, কিন্তু জাপানের সৌভাগ্যক্রমে তিনি দুইবার পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই মহাত্মাই জাপানের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিয়াছেন (Builder of Japan)। ইহাঁর জীবনী পাঠ করিতে ভারতের প্রত্যেক যুবককেই আমি অনুরোধ করি।

শিক্ষার্থে বিদেশগমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হইলেও, আমরা কুপ্রথার বশীভূত হইয়া আমাদের প্রকৃত শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তিদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিই; ফলে এই হয় যে, তাঁহারা স্বদেশের কোনও মঙ্গল সাধন করিতে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পান না। অগত্যা তাঁহারাও সদনুষ্ঠান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে এইরূপ ব্যক্তিরই

প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য। যে মহাত্মাগণ সমাজের শত শত বাধা অতিক্রম করিয়া স্বদেশের উন্নতিকল্পে জগতের অন্যান্য সভ্য দেশে যাইয়া তথাকার লোক চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জাতীয়জীবন-গঠনরূপ দুরূহ কার্য্যানুষ্ঠানের উপযুক্ত। আর যাঁহারা ভারতের বাহিরে কখনও যান নাই, তাঁহারা স্বজাতির দোষ গুণ অন্য জাতির তুলনায় সম্যক্ বিচার করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এবং যত্ন থাকিলেও স্বদেশের উন্নতি সাধনে তাঁহারা আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হন না। কোনও জাতির দোষগুণ উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে সেই জাতীয় লোকের সহিত বহুদিন মিশিতে হয়। উন্নত জাতির যুবকগণের দৈহিক এবং মানসিক বল কিরূপ, তাহা দেখিলেই নিজেদের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। বাহির হইতে কোনও জাতির গুণাবলী সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহাদের দোষগুলি সহজেই দূর হইতেও বুঝা যায়। কোনও জাতির সদ্‌গুণসমূহ বাস্তবিকই গ্রহণ করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে যাইয়া বাস করিতে হয়। যাঁহারা এই মতের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহাদিগকে একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি; পরে যেন তাঁহারা একবার এই বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখেন।

ইংরাজ আদর্শজাতি—ইংরাজেরা অশেষ গুণের আধার এবং এই জন্যই ইঁহারা জগতে শ্রেষ্ঠতালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে তাঁহাদের জাতিগত কোনও দোষ নাই, এ কথা বলা যায় না।

আমরা প্রায় ২০০ শত বৎসরেরও অধিক এইরূপ একটী অমূল্য আদর্শ সম্মুখে পাইয়াও বিশেষ কোনও উপকার লাভ করিতে পারি নাই। ইহার কারণ এই যে আমরা তাঁহাদের প্রকৃত চরিত্র বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদের দোষসমূহ প্রায় সমস্তই আমরা গ্রহণ করিয়াছি, কারণ উহা বাহির হইতেই দৃষ্ট হয়। যে সমস্ত মহাত্মাগণ ইউরোপে যাইয়া ইংরাজদের সঙ্গে মিশিয়াছেন তাঁহারাই উহাদের প্রকৃত গুণাবলী বুঝিয়াছেন। এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া

বাহুল্য মাত্র। নিম্নলিখিত মহাত্মাগণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলেই আমার কথাটীর সত্যতা পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, দাদাভাই নৌরোজী, গোখেলে, লালা লজপত রায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলক, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি, এ, চৌধুরী, ডাঃ জে, সি, বসু, পি, সি, রায় এ, রসুল, বিপিনচন্দ্র পাল, স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তার শরৎচন্দ্র মল্লিক, বরোদাধিপতি, কুচবিহারাধিপতি বর্দ্ধমানাধিরাজ প্রমুখ মহোদয়গণ।

উল্লিখিত মহোদয়গণ ইউরোপে যাইয়া ইংরাজদের মধ্যে বাস না করিলে তাঁহারা স্বদেশ সেবায় মন প্রাণ নিয়োজিত করিতেন কি না তাহা সন্দেহ—স্থল। ইঁহারা স্বাধীনতাপ্রিয়, আত্মনির্ভরশীল, ইংরাজ যুবকগণের সংসর্গে থাকিয়া যেটুকু শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহারই প্রচারে আজ ভারতে নবজীবনের আবির্ভাব হইয়াছে। এস্থলে আর একজন মহাত্মার নাম উল্লেখ যোগ্য, ইনি জন্মভূমির সেবা করিবার জন্ত অতি অল্পদিনই অবসর পাইয়াছিলেন। সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যু ইঁহাকে অপ্রস্ফুটিতাবস্থাতেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এই মহাত্মা আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের অনেক উপকার সাধিত হইত। ইনি সর্ব্বপ্রথম জাপানে যাইয়া ভারতীয় যুবকবৃন্দকে পথ দেখাইয়াছিলেন। ইঁহার নাম রমাকান্ত রায়। ইঁহার অকাল মৃত্যুতে শুধু ভারতবাসী নহে, অনেক সহৃদয় জাপানীও অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। জাপানে অবস্থানকালে জাপানীদের সহিত একত্র বাস করায় রমাকান্ত বাবু যে টুকু 'বুসিদো' (knight's spirit ইহাকে স্বদেশ প্রেম বলা যাইতে পারে) গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহারই ফলে তিনি জন্মভূমির সেবায় রত হইয়াছিলেন। জাপানে না আসিলে তাঁহার হৃদয়ে এরূপ মহৎ ভাবের উদয় হইত কি না বলা যায় না। তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যে যে সমস্ত কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন তাহাই তাহার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

আমাদের আদর্শ—একটী উন্নত জাতিকে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া আদর্শ স্বরূপ ধরিতে পারিলে, জাতীয় জীবন গঠনের পথের দ্বিতীয় অন্তরায় দূরীভূত হইবে।

জাপানের নবাভ্যুদয় এই অন্তরায়টীকে বিনষ্ট করিবে বলিয়া আশা করা যায়। কারণ আজকাল জাপানকে আদর্শ করিবার জন্য অনেক তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। শীঘ্রই উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেই মঙ্গল। এই সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে।

আমরা জাপানে যাইয়া যেরূপ দেখিয়াছি তাহাতে জাপানীদের আচার ব্যবহার অনেকাংশে আমাদের ন্যায়। অধিকন্তু ইঁহারা আমাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জাপানের অভ্যুত্থানে চীনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। চীন এক্ষণে উন্নত হইবার জন্য ব্যস্ত। চীনের উন্নতি সাধন কোন্ দেশের অনুকরণে করা উচিত, তাহা স্থির করিবার জন্য জগতের সর্ব্বত্র চীন দূত (Commissioners) প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মত এই যে, ইউরোপ কিংবা আমেরিকা চীনের আদর্শ হইতে পারে না, কারণ উক্ত প্রদেশসমূহের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জাপানের সহিত চীনের অনেক সাদৃশ্য থাকায়, জাপানই চীনের আদর্শ স্থির হইয়াছে। চীন গভর্ণমেণ্ট সহস্র সহস্র যুবককে এক্ষণে জাপানে সর্ব্ববিষয় শিক্ষার্থে পাঠাইতেছেন। জাপানীদের 'বুসিদো'র শতাংশের একাংশও যদি চীন যুবকেরা গ্রহণ করিতে পারে, তবে চীনের আর কোনও চিন্তা থাকিবে না।

যে দেশ চীনের আদর্শ হইতে পারে, তাহা আমাদেরও আদর্শ হইবার যোগ্য; কারণ আমরাও চীনের ন্যায় বহুকাল হইতে নিদ্রিত আছি। অধিকন্তু এশিয়ার সমস্ত দেশেরই আচার ব্যবহার মূলে প্রায়ই এক প্রকার।

স্বার্থত্যাগী উৎসাহী যুবকের অভাবই আমাদের উন্নতি-পথের তৃতীয় অন্তরায়। জাতীয় জীবন গঠন করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্যাবলী সম্পাদন

করা আবশ্যক, তাহা এই সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র আর কোনও উপায়ে হইতে পারে না।

জাপানীদের জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিতে লিখিতে তাহাদের মধ্যে কিরূপে একতা এবং জাতীয় জীবন সংগঠিত হইল তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারি নাই। কারণ এই তিনটী বিষয় পরস্পর এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট যে একটীর আলোচনা করিতে গেলে অপর দুইটীর কথা উল্লেখ না করিলে চলে না। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে এই তিনটীই এক। ইহাদের একটীর অভাবে অপর কোনটীরই অস্তিত্ব থাকে না এবং ইহাদের মধ্যে যে কোনটীর উৎকর্ষ সাধিত হইলে, সকলগুলিই সম্যক্ উৎকর্ষ লাভ করে। এই সমস্ত কারণে আমি এই তিনটীকে ইচ্ছাক্রমেই প্রায় একার্থবোধক শব্দের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি।

আমাদের দেশে এই তিনটীর একটীও সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত না হওয়ায় আমাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষাই বলুন, একতাই বলুন, আর জাতীয় জীবনই বলুন, ইহাদের মধ্যে একটীকে যদি আমরা সংসাধিত করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট। একতা কিংবা জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে জাতীয় শিক্ষা চাই; আবার জাতীয় শিক্ষা প্রচার করিতে হইলে একতা এবং জাতীয় জীবন চাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইহাদের মধ্যে কোনটীই অগ্রাহ্য নহে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী আমাদিগকে ভিত্তিস্বরূপ ধরিতে হইবে তাহাই আমাদের দেশের চিন্তাশীল স্বদেশহিতৈষী নেতৃবর্গের আলোচ্য বিষয়।

জাপানীদের মধ্যে লুপ্ত প্রায় একতা কিরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা এখানে আর একটু বিস্তৃতভাবে বলা আবশ্যক। জাতীয় শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাপান সম্রাট্ জাপানীদের মধ্য হইতে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সমস্ত জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিলেন। ফলে এই হইল যে

তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে জাপানীমাত্রেই সামুরাইগণের সকল অধিকার পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের ন্যায় সাম্রাজ্যের এবং জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার অবসর পাইলেন। ইঁহারা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ স্বদেশপ্রেমিক সামুরাইগণের সহিত সামাজিকসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ তাঁহাদের গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। বর্ত্তমানে সকল জাপানীর হৃদয়েই 'বুসিদো' সমভাবে নিহিত রহিয়াছে এবং এই জন্য ইঁহারা যুদ্ধে দুর্জ্জয় এবং রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রেমে অতুলনীয়। যদি জাপানীদের মধ্যে জাতিভেদ অদ্যাপি প্রবল থাকিত তাহা হইলে জাপানের অবস্থা কি হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। সামুরাইগণের সংখ্যা মোট ২০,০০০ ছিল। ইঁহারা কি রুশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিতেন!

আমাদের হিন্দুসমাজ হইতে জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিলে ভাল হয়, কি উহা অক্ষুণ্ণ রাখিলে ভাল হয় তাহা আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণের বিবেচ্য। তবে জাতীয় জীবন গঠন কিংবা স্থাপনের পথে জাতিভেদ কণ্টক স্বরূপ, ইহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন।

একভাষী জাতি—জাতীয় একতা সৃষ্টি করিতে হইলে সকলের ভাষা এক হওয়া আবশ্যক; নচেৎ পরস্পরের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব বুঝা যায় না। আমার বোধ হয় সমগ্র ভারতে পুরাকালের ন্যায় একই ভাষা প্রচলিত করিতে কাহারও কোনও আপত্য থাকিবে না, কারণ ইহাতে ইষ্ট বই কাহারও অনিষ্ট ঘটিবে না। বাঙ্গালীরা যেমন গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, তেলাঙ্গু প্রভৃতি ভাষা হইতে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইবেন, মান্দ্রাজী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি জাতিও তদ্রূপ বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষা হইতে নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিবেন। এইরূপে সমস্ত জাতির আশা এবং আকাঙ্ক্ষা এক হইলে তাহাদের মধ্যে একতা না হইয়াই থাকিবে না। একই দেশে নানা-প্রকার প্রাদেশিক ভাষা থাকায় আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে আমাদের দেশ

বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, চীন, জাপান প্রভৃতি বিদেশে যাইতে হইলে যে সমস্ত আয়োজনের আবশ্যক, কলিকাতা হইতে কটক, মাদ্রাজ, বোম্বে, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে যাইতেও তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়; কারণ উল্লিখিত কোনও দেশের ভাষাই আমরা বুঝি না। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপ এবং লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে ?

পাঠকবর্গ! একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন দেখি, যে দিন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই একই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিবে এবং একই ভাষায় লিখিত পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিবে সে দিন কি সুখের হইবে!

একতা সৃষ্টির পথে আর একটী প্রধান অন্তরায়, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বিশ্বাস। চেষ্টা এবং যত্ন থাকিলে এটীও কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত করা যাইতে পারে। জাতি এবং ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যদি জাপানীদের ন্যায় ভারতের সকল গৌরবান্বিত যোগ্য সন্তানগণের প্রতিমূর্ত্তি স্থানে স্থানে রক্ষিত করিয়া উঁহাদের প্রতি সম্যক্ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে একতার সূত্রপাত হইবে সন্দেহ নাই। যেরূপ শিবাজী উৎসব করা হয় সেইরূপ হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্শি সকলে একত্রিত হইয়া আকবর উৎসবও করা উচিত। এইরূপ অনুষ্ঠানে বোধ হয় কোনও ধর্ম্মে বাধা পড়িবেনা অথচ আমাদের মধ্যে সমতা স্থাপিত হইবে।

ভদ্রতা। একতা সাধন করিতে হইলে, কিংবা সাধিত হইলে উহা রক্ষণের জন্য (politeness) ভদ্রতা এবং নম্রতার বিশেষ প্রয়োজন। এই গুণটী যে জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকে, সে জাতি একতার সুদৃঢ়সূত্রে আবদ্ধ না হইয়াই থাকিতে পারে না। যদি ধনী-নির্ধন, ভদ্র-অভদ্র, এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলেই পরস্পরের প্রতি ভদ্র এবং নম্র হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যে সদ্ভাব ও প্রীতি

স্থাপিত হয় তাহাই কালক্রমে একতায় পরিণত হয়। একতার ভিত্তি এইরূপ হইলে তাহা চিরস্থায়ী হয়।

কথার মিষ্টতাতেই জাপানীরা সাধারণতঃ ভদ্রতা এবং নম্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। জাপানী প্রভু এবং ভৃত্যের পরস্পর আচরণ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভদ্রতায় এবং নম্রতায় উভয়েই সমান। প্রভুর এইরূপ ব্যবহার বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। শুধু ভৃত্যকে কেন, যে কোনও ব্যক্তিকে নিজবশে আনিতে হইলে তাহা মিষ্টভাষা দ্বারা যত সহজে হয় তত সহজে আর কোনও উপায়ে হয় না।

আমরা প্রজাবর্গ এবং ভৃত্যগণের প্রতি যেরূপ অসদ্ব্যবহার করি এবং তাহাদের সহিত যেরূপ কদর্য্য ভাষায় কথা বলি তাহাতে আমাদের কোনও সদনুষ্ঠানে তাহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতির আশা করিতে পারি না। তাহাদের প্রতি এরূপ অসদ্ব্যবহার আমাদের সংকীর্ণ-মনেরই পরিচয় দিয়া থাকে। জগতের কোনও সভ্যদেশে এরূপ দৃষ্ট হয় না।

এই যে দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে ইহাতে কি আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে আশানুরূপ সহানুভূতি পাইতেছি? কেন পাইতেছি না তাহা কি পাঠকবর্গ একবার ভাবিয়া দেখিবেন?

বিবাহ পদ্ধতি।

জাপানীদের বিবাহপদ্ধতি তাঁহাদের পূর্ব্ব অসভ্যতার পরিচায়ক। জগতের কোনও সভ্যজাতির বিবাহ ধর্ম্ম ব্যতীত হয় না; কিন্তু জাপানীদের বিবাহের সঙ্গে ধর্ম্মের কোনও সংস্রব নাই, এমন কি তাঁহাদের বিবাহে গুরু কিংবা পুরোহিতের কোনও দরকার হয় না। পূর্ব্বে রাজকীয় কোন আইন-অনুসারেও নবদম্পতীকে আবদ্ধ করা হইত না। তবে আজকাল বিবাহ রেজেষ্টারী করাইতে হয়। বর এবং কন্যার আত্মীয়বর্গই ঘটকের সাহায্যে বিবাহসম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই ঘটক মহাশয়কে অবশ্যই বিবাহিত হইতে হইবে; কারণ তাঁহার স্ত্রীকেও বিবাহে যোগ দান করিতে হয়। তাঁহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

জাপানে বিবাহ যেমন সহজে হয়, তেমনি সহজে উহার বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের নিম্নবর্ণিত * দোষের মধ্যে যে কোনটী থাকিলেই তাহাদিগকে পরিত্যক্তা (Divorced) হইতে হয়। (১) শ্বশুর কিংবা শাশুড়ীর অবাধ্যতা (২) বন্ধ্যাত্ব (৩) অসচ্চরিত্রতা, (৪) স্বামীর উপপত্নী কিংবা অন্যকোনও পারিবারিক লোকের প্রতি হিংসাপ্রদর্শন (৫) কোনও সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া (৬) আত্মীয় স্বজনকে সন্তুষ্ট রাখিতে অসমর্থতা, (৭) চৌর্য্য-প্রবৃত্তি।

---

* পুরাকালে স্ত্রীলোকের উল্লিখিত যে কোনও দোষে শতকরা প্রায় ৩০ টী বিবাহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইত; কিন্তু আজকাল শিক্ষিত জাপ-সমাজ হইতে এ সমস্ত নিয়ম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

জাপানী ক'নে।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

বিবাহ আচার—ঘটক বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলে পর বরপক্ষ হইতে কন্যাপক্ষকে তত্ত্ব করা হয়। এই তত্ত্বের প্রধান অঙ্গ শুষ্ক মৎস্য এবং এক প্রকার সামুদ্রিক তৃণ বিশেষ (Sea-weed)। কেহ কেহ নগদ মুদ্রাও দিয়া থাকেন। তত্ত্বের সামগ্রী একটী কাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া দুই জন বাহক স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়। এই তত্ত্ববাহকগণ আমাদের দেশের ন্যায় পুরস্কার পাইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে অনেক বার উভয় পক্ষ হইতে তত্ত্বের আদান প্রদান হয় কিন্তু কোনও সময়ে কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই। বস্তুতঃ বিবাহ-কার্য্যে জাপানীরা বাহাড়ম্বর আদৌ করেন না। বিবাহের তত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটু বলিবার আছে। অধিকাংশস্থলেই বিবাহের পূর্ব্বে রোহিত মৎস্য (জাপানী ভাষায় 'কই' বলে) উপঢৌকন দেওয়া হইয়া থাকে। এই মৎস্যের আঁশ ছাড়াইয়া, উহার উদরস্থ নাড়ী বাহির করা হয়, পরে চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া পুনরায় জীবিত মৎস্যের ন্যায় জোড়া লাগান হয়। এই সময় পর্য্যন্ত মৎস্যগুলি যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে ধীবরকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হয়। জাপানীরা রোহিত মৎস্যকে 'সামুরাই' (যোদ্ধা) বলিয়া থাকেন। কারণ সামুরাইগণের ন্যায় উহা দুঃসহ যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া থাকে। কুটিবার সময় জাপানের রোহিত মৎস্যগুলিকে মৃতকল্প হইয়া নিস্পন্দভাবে থাকিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কাটিবার সময় উহাদিগকে যেরূপেই আঘাত করা হউক না কেন উহারা একটুমাত্র নড়িবে না কিংবা যন্ত্রণার ভাব প্রদর্শন করিবে না ; আশ্চর্য্য বটে !

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাপানীদের বিবাহে আড়ম্বর নাই। আমরা 'কোবে'র যে বাটীতে বাস করিতাম, তাহার পার্শ্বস্থ বাটীর দুইটী কন্যার বিবাহ হইল ; কিন্তু এত নিকটে থাকিয়াও আমরা উহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। একটী কন্যাকে বিবাহের দিন সন্ধ্যাকালে বিচিত্ররূপে সজ্জিত হইতে

দেখিয়া জানিলাম যে তিনি বিবাহ করিতে যাইতেছেন। বিবাহের দিন জাপ-কন্যা তিন চারবার পোষাক পরিবর্ত্তন করেন। এই 'কিমোনো' (পরিধেয় বস্ত্র) গুলির কাট্ ছাট্ এবং বর্ণ সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা যেরূপ 'কিমোনো' পরিধান করিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা পৃথক্। অধিকাংশই লাল ও বেগুণে রঙের। প্রায়ই গোধূলি লগ্নে কন্যা বরগৃহে বিবাহার্থে গমন করেন। এই সময়ে তিনি একখানি শ্বেতবস্ত্র * পরিধান করিয়া পিত্রালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। কন্যা যাত্রা করিয়া বাহির হইলে, সমস্ত ঘরে, বাড়ীর বাহিরের সম্মুখ দরজায় অগ্নি প্রজ্বালিত করা হয়। বস্তুতঃ মৃতদেহ গৃহ হইতে বাহির করিলে যে যে নিয়ম পালন করা হয় এই সময়ও তাহাই করা হয়; ইহার অর্থ এই যে কন্যার পিত্রালয়-বাস শেষ হইল, তিনি তথা হইতে চির জীবনের মত চলিলেন।

জাপানী স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার ব্যবহার করেন না, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। খোঁপায় একখানি চিরুণী এবং দুই একটি লোহার কাঁটা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। উহা দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির ন্যায়। কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি এবং উহা রক্ষা করিবার জন্য জাপ-রমণীগণ বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। চুলগুলিকে নরম করিয়া আয়ত্ত করিবার জন্য কাঁচা ডিম ভাঙ্গিয়া উহাতে মাখাইয়া থাকেন এবং সপ্তাহে এক বারের অধিক মাথা ধৌত করেন না। এইরূপে বহু যত্নে রক্ষিত খোঁপা যাহাতে সহজে ভাঙ্গিয়া না যায় তজ্জন্য তাঁহারা বালিসে মস্তক স্থাপন না করিয়া কাষ্ঠাসনে ('মাকুরা') ঘাড় রাখিয়া নিদ্রা যাইয়া থাকেন।

---

* জাপানে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া সমাধিক্ষেত্রে মৃতদেহের অনুগমন করিয়া থাকেন।

অতি কষ্টকর হইলেও জাপ-রমণীগণকে বাল্যকাল হইতে উহা শিক্ষা করিয়া অভ্যস্ত হইতে হয়।

চুল বাঁধিবার জন্য অনেক স্থলে দোকান খুলিয়া জাপরমণীগণ বসিয়া থাকেন এবং যাহার ইচ্ছা হয় তিনি পয়সা দিয়া কেশবিন্যাস করাইয়া আসেন। বিবাহের ক'নেরা প্রায় সকলেই দোকান হইতে অতি পরিপাটীরূপে চুল বাঁধাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা যেরূপ খোঁপা বাঁধিয়া থাকেন, ইহাদের খোঁপা তাহার অনুরূপ নহে। কোনও রমণীর বিবাহ হইয়াছে কি না, অধিকাংশ স্থলে তাঁহার কেশ-বন্ধন দেখিলেই বুঝা যায়। তবে আধুনিক রমণীগণের কেহ কেহ ইউরোপীয় ধরণের কেশ-বিন্যাস আরম্ভ করিয়াছেন।

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পর প্রায়ই দুই এক মাস পরে বিবাহ হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে বর এবং ক'নের পরস্পর সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁহাদের উভয়ের ঘর না মিলিলে বিবাহ হয় না। পুরাকালে অভিভাবকের মতানুসারেই বিবাহ হইত। আজকাল যুবকযুবতীর ইচ্ছানুসারেই অধিকাংশ স্থলে বিবাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যুবকের বয়স ৩০ বৎসরের কম হইলে তাঁহাকে অভিভাবকের মতানুসারেই বিবাহ করিতে হইত; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যুবকের বয়স ২৫ বৎসর এবং যুবতীর বয়স ১৬ বৎসর হইলেই তাঁহারা অভিভাবকের মতের অপেক্ষা না করিয়া বিবাহ করিতে পারেন। পাত্রের ২৫ বৎসর এবং পাত্রীর ২০ বৎসর বয়সে সাধারণতঃ জাপানীদের বিবাহ হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের ন্যায় জাপানীরাও বিবাহের জন্য শুভদিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন এবং ঐ দিনের কয়েক দিবস পূর্ব্বে কন্যার প্রয়োজনীয় সমুদয় বস্তু তাঁহার ভাবিস্বামীর গৃহে প্রেরিত হয়। বিবাহ সাধারণতঃ বরগৃহেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে তথায় জায়গার অকুলান হইলে কোনও হোটেলে

যাইয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করা হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ক'নে সুসজ্জিত হইয়া বরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হন। ক'নের মাতাপিতা, ভ্রাতাভগ্নী এবং অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুগণ তাঁহার সহিত যাইয়া থাকেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কন্যার পিত্রালয়ে একটী ভোজ হয়। ইহাই বিদায় ভোজ।

বিবাহের প্রধান অঙ্গ সুরাপান। এই সুরা জাপানে প্রস্তুত হয়। ইহাকে 'সাকে' বলে। জাপানীমাত্রেই 'সাকে' পান করিয়া থাকেন। যে ঘর বিবাহের জন্য নিরূপিত হয়, তাহা পুষ্পদ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয় এবং উহাতে একটী 'বেদী' নির্দ্দিষ্ট থাকে। উক্ত ঘরের দেওয়ালে 'হোরাই' নামক একটী কাল্পনিক দ্বীপের চিত্র বিলম্বিত থাকে। এই দ্বীপে অমরগণ বাস করেন বলিয়া জাপানীদের বিশ্বাস। ইহাতে বক, কচ্ছপ, এবং তিন জোড়া বাঁশ, পাইন, এবং কুল গাছের চিত্র থাকে। বক ১০০০ এক হাজার বৎসর এবং কচ্ছপ ২০০০ দু'হাজার বৎসর বাঁচে বলিয়া জাপানীদের ধারণা।

একখানি শ্বেতবর্ণ কাষ্ঠপাত্রের উপর কাগজনির্ম্মিত একটি বৃদ্ধ ও একটী বৃদ্ধার মূর্ত্তি সংরক্ষিত হয়। এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে অতিশয় দীর্ঘজীবী এবং পরম-সুখী বলিয়া কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। ইহাদিগকে জাপানীতে 'রিয়ো তোম্বা' বলে। 'রিয়ো' শব্দের অর্থ যুগল এবং 'তোম্বা' অতিবৃদ্ধ মনুষ্য। বৃদ্ধকে একটী প্রাচীন পাইন বৃক্ষের তলায় দাঁড় করাইয়া তাহার পার্শ্বে বৃদ্ধাকে উপবেশন করান হয়। উক্ত শাখায় একজোড়া বক তাহাদের ছানাগুলির সহিত বসিয়া থাকে। ইহার অনতিদূরেই একটী পর্ব্বত এবং তাহার পাদ-দেশে সমুদ্র, এই সমুদ্রতীরে লোমময় বৃহল্লাঙ্গুলবিশিষ্ট একটী কচ্ছপ শয়ন করিয়া থাকে। জাপানীরা প্রাকৃতিক শোভাকে কিরূপ আদর করে, এবং উহা অনুকরণ করিতে কতদূর তৎপর তাহা এই দৃশ্যটী হইতে বেশ অনুমান করা যাইতে পারে।

বেদীকে জাপানী ভাষায় "তোকোনামা" বলে, এই তোকানামার সম্মুখে বর ও ক'নে মুখোমুখী হইয়া উপবেশন করেন। এই সময় একখানি বস্ত্রদ্বারা ক'নের মস্তক আংশিকভাবে আচ্ছাদিত করা হয়। অনন্তর ঘটক এবং তাহার স্ত্রী যথাক্রমে বর ও ক'নের হাত ধরিয়া তোকোনামার একটু দূরেই উপবেশন করেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই দুইটী ছোট বালিকা সেই ঘরে প্রবেশ করে। উহাদের একজনকে 'ওচো' ও অপরকে 'মেচো' বলা যায় ['চো' শব্দের অর্থ প্রজাপতি। 'ও' এবং 'মে' যথাক্রমে পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ বোধক]। উহাদের উভয়ের হস্তে একটী করিয়া 'চোসী' অর্থাৎ সুরাপাত্র থাকে। একটী 'চোসী'র গায়ে কাগজ-নির্ম্মিত পুরুষ প্রজাপতি এবং অপরটীর গায়ে স্ত্রীপ্রজাপতি সংলগ্ন থাকে। এই প্রজাপতির ঠিক উপরেই নল। এই নলদ্বারা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া 'সাকে' ঢালিতে হয়। প্রথমতঃ পুরুষ প্রজাপতি অর্থাৎ 'ওচো' কয়েক ফোঁটা সাকে [মদবিশেষ] ঢালিলে পর 'মেচো'ও তাহাই করিতে থাকে। প্রজাপতি দ্বারা এরূপ করাইবার তাৎপর্য্য এই যে, নবদম্পতী যেন প্রজাপতির ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে পারে।

অতঃপর তোকোনামার উপর একখানি শ্বেতবর্ণ কাষ্ঠপাত্র রাখিয়া তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত সুরা-পাত্র দুটী এবং আঠারটী মাটীর পেয়ালা তিন তিনটী করিয়া একত্রে সাজান হয়; বর এবং ক'নে পেয়ালা ধারণ করিলে, উহাতে প্রজাপতিদ্বয় তিন ফোঁটা করিয়া 'সাকে' অতি সন্তর্পণে ফেলিতে থাকে। এইরূপে তাঁহারা প্রত্যেকে তিনবার করিয়া পেয়ালা ধারণ করেন এবং প্রজাপতিদ্বয় তিন ফোঁটা করিয়া সাকে প্রত্যেকবার তাঁহাদের পেয়ালাতে ফেলিয়া থাকে। এই প্রকারে 'সাকে' ঢালাকে 'সান্ সান্ কুদো' অর্থাৎ তিন ত্রিকে নয় বলে (সান্ অর্থ তিন, কুদো অর্থ নয় বার)। 'সাকে' ঢালা হইয়া গেলে বিবাহ শেষ হইয়া যায়। বলা আবশ্যক যে 'সাকে'

চালিবার জন্য যে বালিকাদ্বয় নিযুক্ত হয় তাহারা বিবাহের অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে উহা অভ্যাস করিয়া থাকে।

অনন্তর পার্শ্ববর্ত্তী একটী ঘর হইতে পূর্ব্বোক্ত কাল্পনিক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার সম্বন্ধে একটী গান গাওয়া হয়। গায়ককে বর কিংবা ক’নে দেখিতে পান না।

বিবাহ আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে কেহ বিবাহের ঘরে যাইতে পারে না। বিবাহের পর বর এবং ক’নের আত্মীয়গণ একত্র হইয়া ‘সাকে’ পান করিতে থাকেন। বহুক্ষণ ব্যপিয়া তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে ‘সাকে’ পেয়ালা আদান প্রদান করেন।

বিবাহের কিয়দ্দিন পরে বর ক’নে একত্র * কনে’র পিত্রালয়ে গমন করেন এবং তথায় আর একটী ভোজের অনুষ্ঠান হয়। বিবাহের দিন ক’নে তাহার স্বামীর বাটীস্থ সকলকে প্রণামী দিয়া থাকেন। বিবাহের পর বর যখন শ্বশুর বাটীতে গমন করেন তখন তিনিও সেখানকার সকলকে কিছু না কিছু উপঢৌকন দিয়া থাকেন।

বিবাহের পর ক’নের আর পিত্রালয়ে যাইবার নিয়ম নাই। বিবাহের পর তিনি জন্মের মত পিত্রালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। কচিৎ কখনও বিশেষ দরকার হইলে ক’নে অন্যান্য প্রতিবেশীর ন্যায় কিছু সময়ের জন্য পিত্রালয়ে যাইয়া থাকেন। আমাদের দেশের ন্যায় এক যাত্রায় দুই তিন মাস পিত্রালয়ে বাস ইঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়া উঠে না। স্বামীর মাতা পিতাকেই স্ত্রী মাতা পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন। এবং উঁহাদিগকে সেই-রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

---

* আজকাল শিক্ষিত যুবকেরা বিবাহের পর প্রায় মাসাবধি নব পরিণীতা বধূর সহিত কোনও প্রসিদ্ধ স্থানে গিয়া বাস করেন। ইহার ব্যয়ভার ক’নের পিতা বহন করিয়া থাকেন। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও নিস্তার নাই!

আমাদের আদর্শ—একটী উন্নত জাতিকে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া আদর্শ স্বরূপ ধরিতে পারিলে, জাতীয় জীবন গঠনের পথের দ্বিতীয় অন্তরায় দূরীভূত হইবে।

জাপানের নবাভ্যুদয় এই অন্তরায়টীকে বিনষ্ট করিবে বলিয়া আশা করা যায়। কারণ আজকাল জাপানকে আদর্শ করিবার জন্য অনেক তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। শীঘ্রই উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেই মঙ্গল। এই সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে।

আমরা জাপানে যাইয়া যেরূপ দেখিয়াছি তাহাতে জাপানীদের আচার ব্যবহার অনেকাংশে আমাদের ন্যায়। অধিকন্তু ইঁহারা আমাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জাপানের অভ্যুত্থানে চীনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। চীন এক্ষণে উন্নত হইবার জন্য ব্যস্ত। চীনের উন্নতি সাধন কোন্ দেশের অনুকরণে করা উচিত, তাহা স্থির করিবার জন্য জগতের সর্ব্বত্র চীন দূত (Commissioners) প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহা-দের মত এই যে, ইউরোপ কিংবা আমেরিকা চীনের আদর্শ হইতে পারে না, কারণ উক্ত প্রদেশসমূহের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জাপানের সহিত চীনের অনেক সাদৃশ্য থাকায়, জাপানই চীনের আদর্শ স্থির হইয়াছে। চীন গভর্ণমেণ্ট সহস্র সহস্র যুবককে এক্ষণে জাপানে সর্ব্ববিষয় শিক্ষার্থে পাঠাই-তেছেন। জাপানীদের 'বুসিদো'র শতাংশের একাংশও যদি চীন যুবকেরা গ্রহণ করিতে পারে, তবে চীনের আর কোনও চিন্তা থাকিবে না।

যে দেশ চীনের আদর্শ হইতে পারে, তাহা আমাদেরও আদর্শ হইবার যোগ্য; কারণ আমরাও চীনের ন্যায় বহুকাল হইতে নিদ্রিত আছি। অধিকন্তু এশিয়ার সমস্ত দেশেরই আচার ব্যবহার মূলে প্রায়ই এক প্রকার।

স্বার্থত্যাগী উৎসাহী যুবকের অভাবই আমাদের উন্নতি-পথের তৃতীয় অন্তরায়। জাতীয় জীবন গঠন করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্যাবলী সম্পাদন

করা আবশ্যক, তাহা এই সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র আর কোনও উপায়ে হইতে পারে না।

জাপানীদের জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিতে লিখিতে তাহাদের মধ্যে কিরূপে একতা এবং জাতীয় জীবন সংগঠিত হইল তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারি নাই। কারণ এই তিনটী বিষয় পরস্পর এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট যে একটীর আলোচনা করিতে গেলে অপর দুইটীর কথা উল্লেখ না করিলে চলে না। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে এই তিনটীই এক। ইহাদের একটীর অভাবে অপর কোনটীরই অস্তিত্ব থাকে না এবং ইহাদের মধ্যে যে কোনটীর উৎকর্ষ সাধিত হইলে, সকলগুলিই সম্যক্ উৎকর্ষ লাভ করে। এই সমস্ত কারণে আমি এই তিনটীকে ইচ্ছাক্রমেই প্রায় একার্থবোধক শব্দের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি।

আমাদের দেশে এই তিনটীর একটীও সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত না হওয়ায় আমাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষাই বলুন, একতাই বলুন, আর জাতীয় জীবনই বলুন, ইহাদের মধ্যে একটীকে যদি আমরা সংসাধিত করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট। একতা কিংবা জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে জাতীয় শিক্ষা চাই; আবার জাতীয় শিক্ষা প্রচার করিতে হইলে একতা এবং জাতীয় জীবন চাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইহাদের মধ্যে কোনটীই অগ্রাহ্য নহে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী আমাদিগকে ভিত্তিস্বরূপ ধরিতে হইবে তাহাই আমাদের দেশের চিন্তাশীল স্বদেশহিতৈষী নেতৃবর্গের আলোচ্য বিষয়।

জাপানীদের মধ্যে লুপ্ত প্রায় একতা কিরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা এখানে আর একটু বিস্তৃতভাবে বলা আবশ্যক। জাতীয় শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাপান সম্রাট্ জাপানীদের মধ্য হইতে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সমস্ত জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিলেন। ফলে এই হইল যে

তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে জাপানীমাত্রেই সামুরাইগণের সকল অধিকার পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের ন্যায় সাম্রাজ্যের এবং জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার অবসর পাইলেন। ইঁহারা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ স্বদেশপ্রেমিক সামুরাইগণের সহিত সামাজিকসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ তাঁহাদের গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। বর্ত্তমানে সকল জাপানীর হৃদয়েই 'বুসিদো' সমভাবে নিহিত রহিয়াছে এবং এই জন্য ইঁহারা যুদ্ধে দুর্জ্জেয় এবং রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রেমে অতুলনীয়। যদি জাপানীদের মধ্যে জাতিভেদ অদ্যাপি প্রবল থাকিত তাহা হইলে জাপানের অবস্থা কি হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। সামুরাইগণের সংখ্যা মোট ২০,০০০ ছিল। ইঁহারা কি রুশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিতেন!

আমাদের হিন্দুসমাজ হইতে জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিলে ভাল হয়, কি উহা অক্ষুন্ন রাখিলে ভাল হয় তাহা আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণের বিবেচ্য। তবে জাতীয় জীবন গঠন কিংবা স্থাপনের পথে জাতিভেদ কণ্টক স্বরূপ, ইহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন।

একভাষী জাতি—জাতীয় একতা সৃষ্টি করিতে হইলে সকলের ভাষা এক হওয়া আবশ্যক; নচেৎ পরস্পরের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব বুঝা যায় না। আমার বোধ হয় সমগ্র ভারতে পুরাকালের ন্যায় একই ভাষা প্রচলিত করিতে কাহারও কোনও আপত্য থাকিবে না, কারণ ইহাতে ইষ্ট বই কাহারও অনিষ্ট ঘটিবে না। বাঙ্গালীরা যেমন গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, তেলাঙ্গু প্রভৃতি ভাষা হইতে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইবেন, মান্দ্রাজী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি জাতিও তদ্রূপ বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষা হইতে নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিবেন। এইরূপে সমস্ত জাতির আশা এবং আকাজ্ক্ষা এক হইলে তাহাদের মধ্যে একতা না হইয়াই থাকিবে না। একই দেশে নানা-প্রকার প্রাদেশিক ভাষা থাকায় আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে আমাদের দেশ

বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, চীন, জাপান প্রভৃতি বিদেশে যাইতে হইলে যে সমস্ত আয়োজনের আবশ্যক, কলিকাতা হইতে কটক, মাদ্রাজ, বোম্বে, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে যাইতেও তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়; কারণ উল্লিখিত কোনও দেশের ভাষাই আমরা বুঝি না। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপ এবং লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

পাঠকবর্গ! একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন দেখি, যে দিন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই একই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিবে এবং একই ভাষায় লিখিত পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিবে সে দিন কি সুখের হইবে!

একতা সৃষ্টির পথে আর একটী প্রধান অন্তরায়, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বিশ্বাস। চেষ্টা এবং যত্ন থাকিলে এটীও কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত করা যাইতে পারে। জাতি এবং ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যদি জাপানীদের ন্যায় ভারতের সকল গৌরবান্বিত যোগ্য সন্তানগণের প্রতিমূর্ত্তি স্থানে স্থানে রক্ষিত করিয়া উহাদের প্রতি সম্যক্ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে একতার সূত্রপাত হইবে সন্দেহ নাই। যেরূপ শিবাজী উৎসব করা হয় সেইরূপ হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্শি সকলে একত্রিত হইয়া আকবর উৎসবও করা উচিত। এইরূপ অনুষ্ঠানে বোধ হয় কোনও ধর্ম্মে বাধা পড়িবেনা অথচ আমাদের মধ্যে সমতা স্থাপিত হইবে।

ভদ্রতা। একতা সাধন করিতে হইলে, কিংবা সাধিত হইলে উহা রক্ষণের জন্য (politeness) ভদ্রতা এবং নম্রতার বিশেষ প্রয়োজন। এই গুণটী যে জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকে, সে জাতি একতার সুদৃঢ়সূত্রে আবদ্ধ না হইয়াই থাকিতে পারে না। যদি ধনী-নির্ধন, ভদ্র-অভদ্র, এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলেই পরস্পরের প্রতি ভদ্র এবং নম্র হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যে সদ্ভাব ও প্রীতি

স্থাপিত হয় তাহাই কালক্রমে একতায় পরিণত হয়। একতার ভিত্তি এইরূপ হইলে তাহা চিরস্থায়ী হয়।

কথার মিষ্টতাতেই জাপানীরা সাধারণতঃ ভদ্রতা এবং নম্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। জাপানী প্রভু এবং ভৃত্যের পরস্পর আচরণ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভদ্রতায় এবং নম্রতায় উভয়েই সমান। প্রভুর এইরূপ ব্যবহার বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। শুধু ভৃত্যকে কেন, যে কোনও ব্যক্তিকে নিজবশে আনিতে হইলে তাহা মিষ্টভাষা দ্বারা যত সহজে হয় তত সহজে আর কোনও উপায়ে হয় না।

আমরা প্রজাবর্গ এবং ভৃত্যগণের প্রতি যেরূপ অসদ্ব্যবহার করি এবং তাহাদের সহিত যেরূপ কদর্য্য ভাষায় কথা বলি তাহাতে আমাদের কোনও সদনুষ্ঠানে তাহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতির আশা করিতে পারি না। তাহাদের প্রতি এরূপ অসদ্ব্যবহার আমাদের সংকীর্ণ-মনেরই পরিচয় দিয়া থাকে। জগতের কোনও সভ্যদেশে এরূপ দৃষ্ট হয় না।

এই যে দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে ইহাতে কি আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে আশানুরূপ সহানুভূতি পাইতেছি? কেন পাইতেছি না তাহা কি পাঠকবর্গ একবার ভাবিয়া দেখিবেন?

বিবাহ পদ্ধতি।

জাপানীদের বিবাহপদ্ধতি তাঁহাদের পূর্ব্ব অসভ্যতার পরিচায়ক। জগতের কোনও সভ্যজাতির বিবাহ ধর্ম্ম ব্যতীত হয় না; কিন্তু জাপানীদের বিবাহের সঙ্গে ধর্ম্মের কোনও সংস্রব নাই, এমন কি তাঁহাদের বিবাহে গুরু কিংবা পুরোহিতের কোনও দরকার হয় না। পূর্ব্বে রাজকীয় কোন আইন-অনুসারেও নবদম্পতীকে আবদ্ধ করা হইত না। তবে আজকাল বিবাহ রেজেষ্টারী করাইতে হয়। বর এবং কন্যার আত্মীয়বর্গই ঘটকের সাহায্যে বিবাহসম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই ঘটক মহাশয়কে অবশ্যই বিবাহিত হইতে হইবে; কারণ তাঁহার স্ত্রীকেও বিবাহে যোগ দান করিতে হয়। তাঁহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

জাপানে বিবাহ যেমন সহজে হয়, তেমনি সহজে উহার বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের নিম্নবর্ণিত * দোষের মধ্যে যে কোনটী থাকিলেই তাহাদিগকে পরিত্যক্তা (Divorced) হইতে হয়। (১) শ্বশুর কিংবা শাশুড়ীর অবাধ্যতা (২) বন্ধ্যাত্ব (৩) অসচ্চরিত্রতা, (৪) স্বামীর উপপত্নী কিংবা অন্যকোনও পারিবারিক লোকের প্রতি হিংসাপ্রদর্শন (৫) কোনও সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া (৬) আত্মীয় স্বজনকে সন্তুষ্ট রাখিতে অসমর্থতা, (৭) চৌর্য্য-প্রবৃত্তি।

---

* পুরাকালে স্ত্রীলোকের উল্লিখিত যে কোনও দোষে শতকরা প্রায় ৩০ টী বিবাহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইত; কিন্তু আজকাল শিক্ষিত জাপ-সমাজ হইতে এ সমস্ত নিয়ম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

বিবাহ আচার—ঘটক বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলে পর বরপক্ষ হইতে কন্যাপক্ষকে তত্ত্ব করা হয়। এই তত্ত্বের প্রধান অঙ্গ শুষ্ক মৎস্য এবং এক প্রকার সামুদ্রিক তৃণ বিশেষ (Sea-weed)। কেহ কেহ নগদ মুদ্রাও দিয়া থাকেন। তত্ত্বের সামগ্রী একটী কাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া দুই জন বাহক স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়। এই তত্ত্ববাহকগণ আমাদের দেশের ন্যায় পুরস্কার পাইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে অনেক বার উভয় পক্ষ হইতে তত্ত্বের আদান প্রদান হয় কিন্তু কোনও সময়ে কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই। বস্তুতঃ বিবাহ-কার্য্যে জাপানীরা বাহ্যাড়ম্বর আদৌ করেন না। বিবাহের তত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটু বলিবার আছে। অধিকাংশস্থলেই বিবাহের পূর্ব্বে রোহিত মৎস্য (জাপানী ভাষায় 'কই' বলে) উপঢৌকন দেওয়া হইয়া থাকে। এই মৎস্যের আঁশ ছাড়াইয়া, উহার উদরস্থ নাড়ী বাহির করা হয়, পরে চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া পুনরায় জীবিত মৎস্যের ন্যায় জোড়া লাগান হয়। এই সময় পর্য্যন্ত মৎস্যগুলি যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে ধীবরকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হয়। জাপানীরা রোহিত মৎস্যকে 'সামুরাই' (যোদ্ধা) বলিয়া থাকেন। কারণ সামুরাইগণের ন্যায় উহা দুঃসহ যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া থাকে। কুটিবার সময় জাপানের রোহিত মৎস্যগুলিকে মৃতকল্প হইয়া নিস্পন্দভাবে থাকিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কাটিবার সময় উহাদিগকে যেরূপেই আঘাত করা হউক না কেন উহারা একটুমাত্র নড়িবে না কিংবা যন্ত্রণার ভাব প্রদর্শন করিবে না ; আশ্চর্য্য বটে !

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাপানীদের বিবাহে আড়ম্বর নাই। আমরা 'কোবে'র যে বাটীতে বাস করিতাম, তাহার পার্শ্বস্থ বাটীর দুইটী কন্যার বিবাহ হইল ; কিন্তু এত নিকটে থাকিয়াও আমরা উহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। একটী কন্যাকে বিবাহের দিন সন্ধ্যাকালে বিচিত্ররূপে সজ্জিত হইতে

দেখিয়া জানিলাম যে তিনি বিবাহ করিতে যাইতেছেন। বিবাহের দিন জাপ-কন্যা তিন চারবার পোষাক পরিবর্ত্তন করেন। এই 'কিমোনো' (পরিধেয় বস্ত্র) গুলির কাট্ ছাট্ এবং বর্ণ সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা যেরূপ 'কিমোনো' পরিধান করিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা পৃথক্। অধিকাংশই লাল ও বেগুণে রঙের। প্রায়ই গোধুলি লগ্নে কন্যা বরগৃহে বিবাহার্থে গমন করেন। এই সময়ে তিনি একখানি শ্বেতবস্ত্র * পরিধান করিয়া পিত্রালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। কন্যা যাত্রা করিয়া বাহির হইলে, সমস্ত ঘরে, বাড়ীর বাহিরের সম্মুখ দরজায় অগ্নি প্রজ্বালিত করা হয়। বস্তুতঃ মৃতদেহ গৃহ হইতে বাহির করিলে যে যে নিয়ম পালন করা হয় এই সময়ও তাহাই করা হয়; ইহার অর্থ এই যে কন্যার পিত্রালয়-বাস শেষ হইল, তিনি তথা হইতে চির জীবনের মত, চলিলেন।

জাপানী স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার ব্যবহার করেন না, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। খোঁপায় একখানি চিরুণী এবং দুই একটি লোহার কাঁটা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। উহা দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির ন্যায়। কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি এবং উহা রক্ষা করিবার জন্য জাপ-রমণীগণ বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। চুলগুলিকে নরম করিয়া আরও করিবার জন্য কাঁচা ডিম্ব ভাঙ্গিয়া উহাতে মাখাইয়া থাকেন এবং সপ্তাহে এক বারের অধিক মাথা ধৌত করেন না। এইরূপে বহু যত্নে রক্ষিত খোঁপা যাহাতে সহজে ভাঙ্গিয়া না যায় তজ্জন্য তাঁহারা বালিসে মস্তক স্থাপন না করিয়া কাষ্ঠাসনে ('মাকুরা') ঘাড় রাখিয়া নিদ্রা যাইয়া থাকেন।

---

* জাপানে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া সমাধিক্ষেত্রে মৃতদেহের অনুগমন করিয়া থাকেন।

অতি কষ্টকর হইলেও জাপ-রমণীগণকে বাল্যকাল হইতে উহা শিক্ষা করিয়া অভ্যস্ত হইতে হয়।

চুল বাঁধিবার জন্য অনেক স্থলে দোকান খুলিয়া জাপরমণীগণ বসিয়া থাকেন এবং যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি পয়সা দিয়া কেশবিন্যাস করাইয়া আসেন। বিবাহের ক'নেরা প্রায় সকলেই দোকান হইতে অতি পরিপাটীরূপে চুল বাঁধাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা যেরূপ খোঁপা বাঁধিয়া থাকেন, ইহাদের খোঁপা তাহার অনুরূপ নহে। কোনও রমণীর বিবাহ হইয়াছে কি না, অধিকাংশ স্থলে তাঁহার কেশ-বন্ধন দেখিলেই বুঝা যায়। তবে আধুনিক রমণীগণের কেহ কেহ ইউরোপীয় ধরণের কেশ-বিন্যাস আরম্ভ করিয়াছেন।

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পর প্রায়ই দুই এক মাস পরে বিবাহ হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে বর এবং ক'নের পরস্পর সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁহাদের উভয়ের মত না মিলিলে বিবাহ হয় না। পুরাকালে অভিভাবকের মতানুসারেই বিবাহ হইত। আজকাল যুবকযুবতীর ইচ্ছানুসারেই অধিকাংশ স্থলে বিবাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যুবকের বয়স ৩০ বৎসরের কম হইলে তাঁহাকে অভিভাবকের মতানুসারেই বিবাহ করিতে হইত; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যুবকের বয়স ২৫ বৎসর এবং যুবতীর বয়স ২৬ বৎসর হইলেই তাঁহারা অভিভাবকের মতের অপেক্ষা না করিয়া বিবাহ করিতে পারেন। পাত্রের ২৫ বৎসর এবং পাত্রীর ২০ বৎসর বয়সে সাধারণতঃ জাপানীদের বিবাহ হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের ন্যায় জাপানীরাও বিবাহের জন্য শুভদিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন এবং ঐ দিনের কয়েক দিবস পূর্ব্বে কন্যার প্রয়োজনীয় সমুদয় বস্তু তাঁহার ভাবিস্বামীর গৃহে প্রেরিত হয়। বিবাহ সাধারণতঃ বরগৃহেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে তথায় জায়গার অকুলান হইলে কোনও হোটেলে

যাইয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করা হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ক'নে সুসজ্জিত হইয়া বরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হন। ক'নের মাতাপিতা, ভ্রাতাভগ্নী এবং অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুগণ তাঁহার সহিত যাইয়া থাকেন। বিবাহের পুর্ব্বদিন রাত্রিতে কন্যার পিত্রালয়ে একটী ভোজ হয়। ইহাই বিদায় ভোজ।

বিবাহের প্রধান অঙ্গ সুরাপান। এই সুরা জাপানে প্রস্তুত হয়। ইহাকে 'সাকে' বলে। জাপানীমাত্রেই 'সাকে' পান করিয়া থাকেন। যে ঘর বিবাহের জন্য নিরূপিত হয়, তাহা পুষ্পদ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয় এবং উহাতে একটী 'বেদী' নির্দ্দিষ্ট থাকে। উক্ত ঘরের দেওয়ালে 'হোরাই' নামক একটী কাল্পনিক দ্বীপের চিত্র বিলম্বিত থাকে। এই দ্বীপে অমরগণ বাস করেন বলিয়া জাপানীদের বিশ্বাস। ইহাতে বক, কচ্ছপ, এবং তিন জোড়া বাঁশ, পাইন, এবং কুল গাছের চিত্র থাকে। বক ১০০০ এক হাজার বৎসর এবং কচ্ছপ ২০০০ দু'হাজার বৎসর বাঁচে বলিয়া জাপানীদের ধারণা।

একখানি শ্বেতবর্ণ কাষ্ঠপাত্রের উপর কাগজনির্ম্মিত একটি বৃদ্ধ ও একটী বৃদ্ধার মূর্ত্তি সংরক্ষিত হয়। এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে অতিশয় দীর্ঘজীবী এবং পরম-সুখী বলিয়া কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। ইহাদিগকে জাপানীতে 'রিয়ো তোম্বা' বলে। 'রিয়ো' শব্দের অর্থ যুগল এবং 'তোম্বা' অতিবৃদ্ধ মনুষ্য। বৃদ্ধকে একটী প্রাচীন পাইন বৃক্ষের তলায় দাঁড় করাইয়া তাহার পার্শ্বে বৃদ্ধাকে উপবেশন করান হয়। উক্ত শাখায় একজোড়া বক তাহাদের ছানাগুলির সহিত বসিয়া থাকে। ইহার অনতিদূরেই একটী পর্ব্বত এবং তাহার পাদ-দেশে সমুদ্র, এই সমুদ্রতীরে লোমময় বৃহল্লাঙ্গুলবিশিষ্ট একটী কচ্ছপ শয়ন করিয়া থাকে। জাপানীরা প্রাকৃতিক শোভাকে কিরূপ আদর করে, এবং উহা অনুকরণ করিতে কতদুর তৎপর তাহা এই দৃশ্যটী হইতে বেশ অনুমান করা যাইতে পারে।

বেদীকে জাপানী ভাষায় "তোকোনামা" বলে, এই তোকানামার সম্মুখে বর ও ক'নে মুখোমুখী হইয়া উপবেশন করেন। এই সময় একখানি বস্ত্রদ্বারা ক'নের মস্তক আংশিকভাবে আচ্ছাদিত করা হয়। অনন্তর ঘটক এবং তাহার স্ত্রী যথাক্রমে বর ও ক'নের হাত ধরিয়া তোকোনামার একটু দূরেই উপবেশন করেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তুইটী ছোট বালিকা সেই ঘরে প্রবেশ করে। উহাদের একজনকে 'ওচো' ও অপরকে 'মেচো' বলা যায় ['চো' শব্দের অর্থ প্রজাপতি। 'ও' এবং 'মে' যথাক্রমে পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ বোধক]। উহাদের উভয়ের হস্তে একটী করিয়া 'চোসী' অর্থাৎ সুরাপাত্র থাকে। একটী 'চোসী'র গায়ে কাগজ-নির্ম্মিত পুরুষ প্রজাপতি এবং অপরটীর গায়ে স্ত্রীপ্রজাপতি সংলগ্ন থাকে। এই প্রজাপতির ঠিক উপরেই নল। এই নলদ্বারা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া 'সাকে' ঢালিতে হয়। প্রথমতঃ পুরুষ প্রজাপতি অর্থাৎ 'ওচো' কয়েক ফোঁটা সাকে [মদবিশেষ] ঢালিলে পর 'মেচো'ও তাহাই করিতে থাকে। প্রজাপতি দ্বারা এরূপ করাইবার তাৎপর্য্য এই যে, নবদম্পতী যেন প্রজাপতির ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে পারে।

অতঃপর তোকোনামার উপর একখানি শ্বেতবর্ণ কাষ্ঠপাত্র রাখিয়া তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত সুরা-পাত্র তুটী এবং আঠারটী মাটীর পেয়ালা তিন তিনটী করিয়া একত্রে সাজান হয়; বর এবং ক'নে পেয়ালা ধারণ করিলে, উহাতে প্রজাপতিদ্বয় তিন ফোঁটা করিয়া 'সাকে' অতি সন্তর্পণে ফেলিতে থাকে। এইরূপে তাঁহারা প্রত্যেকে তিনবার করিয়া পেয়ালা ধারণ করেন এবং প্রজাপতিদ্বয় তিন ফোঁটা করিয়া সাকে প্রত্যেকবার তাঁহাদের পেয়ালাতে ফেলিয়া থাকে। এই প্রকারে 'সাকে' ঢালাকে 'সান্ সান্ কুদো' অর্থাৎ তিন ত্রিকে নয় বলে (সান্ অর্থ তিন, কুদো অর্থ নয় বার)। 'সাকে' ঢালা হইয়া গেলে বিবাহ শেষ হইয়া যায়। বলা আবশ্যক যে 'সাকে',

চালিবার জন্য যে বালিকাদ্বয় নিযুক্ত হয় তাহারা বিবাহের অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে উহা অভ্যাস করিয়া থাকে।

অনন্তর পার্শ্ববর্ত্তী একটী ঘর হইতে পূর্ব্বোক্ত কাল্পনিক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার সম্বন্ধে একটী গান গাওয়া হয়। গায়ককে বর কিংবা ক'নে দেখিতে পান না।

বিবাহ আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে কেহ বিবাহের ঘরে যাইতে পারে না। বিবাহের পর বর এবং ক'নের আত্মীয়গণ একত্র হইয়া 'সাকে' পান করিতে থাকেন। বহুক্ষণ ব্যপিয়া তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে 'সাকে' পেয়ালা আদান প্রদান করেন।

বিবাহের কিয়দ্দিন পরে বর ক'নে একত্র * কনে'র পিত্রালয়ে গমন করেন এবং তথায় আর একটী ভোজের অনুষ্ঠান হয়। বিবাহের দিন ক'নে তাহার স্বামীর বাটীস্থ সকলকে প্রণামী দিয়া থাকেন। বিবাহের পর বর যখন শ্বশুর বাটীতে গমন করেন তখন তিনিও সেখানকার সকলকে কিছু না কিছু উপঢৌকন দিয়া থাকেন।

বিবাহের পর ক'নের আর পিত্রালয়ে যাইবার নিয়ম নাই। বিবাহের পর তিনি জন্মের মত পিত্রালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। কচিৎ কখনও বিশেষ দরকার হইলে ক'নে অন্যান্য প্রতিবেশীর ন্যায় কিছু সময়ের জন্য পিত্রালয়ে যাইয়া থাকেন। আমাদের দেশের ন্যায় এক যাত্রায় দুই তিন মাস পিত্রালয়ে বাস ইঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়া উঠে না। স্বামীর মাতা পিতাকেই স্ত্রী মাতা পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন। এবং উঁহাদিগকে সেই-রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

---

* আজকাল শিক্ষিত যুবকেরা বিবাহের পর প্রায় মাসাবধি নব পরিণীতা বধুর সহিত কোনও প্রসিদ্ধ স্থানে গিয়া বাস করেন। ইহার ব্যয়ভার ক'নের পিতা বহন করিয়া থাকেন। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও নিস্তার নাই!

বিবাহের পর বরের জীবনেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। বর যদি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পৃথক বাটী নির্ম্মাণ করিতে হয়। কারণ পিতার বিষয় সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠ ব্যতীত (Law of primogeniture) অন্য কোনও পুত্রের অধিকার নাই। মাতা পিতার বৃদ্ধাবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্রই তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য দায়ী। অন্যান্য পুত্রেরা উপার্জ্জনক্ষম হইলে বিবাহ করিয়া পৃথক বাটী করিয়া বাস করেন। তাঁহারা পিতামাতার খোঁজ খবর না লইলেও পারেন। তবে যদি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া মাতাপিতার সেবা করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। মাতৃপিতৃভক্তিতে জাপানীরা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও প্রভুভক্তি এবং স্বদেশ প্রেমে তাঁহারা অদ্বিতীয়। যাঁহারা মাতাপিতাকে যথোচিত ভক্তি করিতে জানেন না, তাঁহারা যে কিরূপে স্বদেশপ্রেমিক হন, তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত। তবে ইহাও সত্য যে আধুনিক শিক্ষিত জাপানীদের মধ্যে মাতৃপিতৃ ভক্তের অভাব নাই।

বহু বিবাহের প্রথা জাপানে পুর্ব্বেও ছিল না এখনও নাই। তবে ইচ্ছা করিলে সকল জাপানীই উপপত্নী রাখিতে পারেন। জাপানে উপ-পত্নীকে পত্নীর সমস্ত অধিকারই সমানভাবে দেওয়া হয়। এই জন্য অনেকে কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে উপপত্নীরূপে দান করিতে পারিলেও সন্তুষ্ট হন।

জাপানে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। সেখানে অধিকাংশ বিধবা রমণীই পুনর্ব্বিবাহ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের স্ত্রী বিয়োগ ঘটিয়াছে তাঁহারাই সাধারণতঃ এই বিধবাগণকে বিবাহ করিয়া থাকেন। এই নিয়মটী বেশ প্রশংসনীয়। বিধবার বিবাহ সমদশাপন্ন পুরুষের সহিত সংঘটিত হওয়ার চরিত্র জিনিষটী দুইজনের মধ্যেই সমভাবে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহাতে স্বার্থপর পুরুষ জাতিকে চরিত্রের মূল্য বুঝিবার অবসর দেওয়া হয়। সকল সমাজই স্ত্রী জাতির চরিত্র লইয়া ব্যস্ত; কিন্তু পুরুষচরিত্র সম্বন্ধে সকলেই

চুপ ; যেন পুরুষগণ দেবতা, তাহাদের চরিত্রে দোষ স্পর্শিতে পারে না। জগতের অন্যান্য জাতির কথা দূরে থাকুক, যে হিন্দু-সমাজে সতীত্বের এত গৌরব, সেখানে পুরুষ-চরিত্র কিরূপ হওয়া আবশ্যক ? পুরুষই স্ত্রীজাতির আদর্শ, কিন্তু হিন্দু সমাজের মুমুর্ষুদশাপন্ন পুরুষগণও স্ত্রীবিয়োগান্তে অবিলম্বে বিবাহ করিয়া অবলা জাতিকে কি শিক্ষা দিয়া থাকেন ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে * জাপানীদের বিধবা-বিবাহের পদ্ধতি অতি প্রশংসনীয়। হিন্দু সমাজেও ঐরূপ প্রথা প্রচলিত করা যায় না কি ? একজন অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের হস্তে তদীয় পৌত্রীস্থানীয়া এক বেচারি বালিকাকে অর্পণ না করিয়া তাঁহার উপযুক্ত ৬০ বৎসর বয়স্কা একটী পাত্রীকে দিলে ভাল হয় না কি ? এরূপ প্রথা প্রচলিত হইলে হিন্দু সমাজের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে এবং স্ত্রীজাতির আশীর্ব্বাদে জাতীয় গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। হিন্দু রমণীগণের অভিশাপেই ভারতের এ দশা হইয়াছে। যে দেশে স্ত্রীলোকের যথোচিত সম্মান না করা হয়, সে দেশ কখনই উন্নতি করিতে পারে না। উন্নত সমস্ত জাতির ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। পুরাকালে আর্য্যগণ স্ত্রী জাতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন বলিয়াই তাঁহারা জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জাপানে বিধবা বিবাহের কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আশা করি পাঠকবর্গ তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

---

* শতকরা ৩।৪ জন লোক দ্বিতীয় পক্ষে কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন। এটী সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। অর্থবলই এগুলির মূল।

পালোয়ান।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

কবরীবন্ধন—এস্থলে জাপানের কবরীবন্ধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; কারণ পুরাকালে জাপানীদের বয়স, ব্যবসায় এবং কোনও স্ত্রীলোক বিবাহিতা কি না তাহা তাহার কবরীবন্ধন হইতেই জানা যাইত।

জাপানীরা যত বিচিত্ররূপে খোঁপা বাঁধিতে পারে, জগতে আর কোনও জাতি সেরূপ পারে কিনা সন্দেহ। পূর্ব্বে জাতি এবং ব্যবসায় হিসাবে পুরুষেরাও নানাপ্রকার খোঁপা বাঁধিত, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের সংসর্গে আসিয়া এক্ষণে পুরুষেরা প্রায় সকলেই (কুস্তিওয়ালারা ব্যতীত) সাধারণভাবে চুল কাটিয়া ফেলে। কোনও বালক কিংবা বালিকার বয়স তাহার কেশ কর্ত্তনের ভাব হইতে বুঝিতে পারা যায়। প্রায় চুয়ান্ন প্রকার কবরী বন্ধনের মধ্যে প্রজাপতির ন্যায় খোঁপা সাধারণতঃ প্রচলিত। স্কুল ও কলেজের মেয়েরা ইউরোপীয় রমণীগণের ন্যায় কবরী বন্ধন করিলেও আজও মাথায় টুপি দেন নাই।

বর্ত্তমান 'মেজি' অব্দের পূর্ব্বে (Before the Era of Reformation) পর্য্যন্ত জাপানীরা মস্তকের চুল স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় লম্বা রাখিতেন। ঐ চুলগুলি খোঁপা বাঁধিয়া ঠিক মস্তকের মধ্যভাগে রক্ষিত হইত। কেহ কেহ উহা পশ্চাদ্দিকে কিঞ্চিৎ সরাইয়া বন্ধন করিতেন। শ্রেণী এবং বর্ণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে চুল বাঁধা হইত। মস্তকের কেশবন্ধন দেখিলেই পূর্ব্বে জাপানীদের মধ্যে কিরূপ বর্ণভেদ ছিল তাহার আভাস পাওয়া যাইত। আজ পর্য্যন্তও স্থানে স্থানে বিচিত্র কেশ বন্ধন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কুস্তিওয়ালারা *

* জাপানী কুস্তিওয়ালাদের আকার সাধারণ জাপানীদের অপেক্ষা অনেক বড়। ইহাদের শরীরে অসামান্য শক্তি। ইহাদের অবয়ব সৃষ্টি করিতে বিধাতা পুরুষকে তুলাদণ্ড ধরিয়া অস্থি এবং মাংসের সামঞ্জস্য করিতে হইয়াছে। ইহাদের শরীরের কোনও অংশ অপূর্ণ নাই। দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান।

(Wrestlers) এখনও পর্য্যন্ত পুরাকালের ন্যায় চুল বন্ধন করিয়া থাকে। পূর্ব্ব পুরুষগণের স্মৃতি জ্বলন্ত রাখিবার জন্য কেশ পাশ ইহাদের মস্তকে স্তম্ভ স্বরূপ বিরাজমান।

আর একশ্রেণীর জাপানী সম্মুখ হইতে মাথার চুল মুড়িয়া ফেলিয়া পশ্চাতে খোঁপা বাঁধিত। এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ আলোচনা করিতে হইলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এরূপ ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা অসম্ভব।

বর্ত্তমান জাপানীদের কেশ কর্ত্তন সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। ইহাঁরা এক্ষণে সর্ব্ব বিষয়েই ইউরোপীয়ানদের অনুকরণ করিতেছেন। কি পোষাক পরিচ্ছদে, কি কেশ বিন্যাসে, কোনও বিষয়েই ইহাঁরা ইউরোপীয়ান-দের অপেক্ষা হীন নহেন। আধুনিক জাপানীরা সাবানদ্বারা মস্তক ধৌত করিয়া থাকেন, এবং তৈল মর্দ্দন আদৌ করেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁরা চুল প্রায়ই ছোট করিয়া কাটিয়া থাকেন। জাপানী প্রামাণিকেরা ক্ষৌর কার্য্যে বেশ দক্ষ। ইহাদের অনেকেই ইউরোপ এবং আমেরিকা হইতে ক্ষৌর কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় জাপানী প্রামাণিকগণও কাহারও বাটীতে গমন করে না। তাহারা তাহাদের স্ব স্ব দোকান অতি পরিপাটীরূপে সাজাইয়া রাখে এবং যাঁহার ইচ্ছা তথায় যাইয়া চুল কাটাইয়া আসেন। চুল কাটা হইলে সাবান দ্বারা মস্তক ধৌত করাইয়া এসেন্স এবং পাউডার মাখাইয়া দেওয়া হয়। ইহাদের দ্বারা ক্ষৌরি হইতে বেশ আরাম আছে। অনেকেই ইহাদের চেয়ারের উপর ছোট খাটো একটা ঘুম দিয়া থাকেন। পয়সাও বড় বেশী লাগে না (৫ হইতে ২০ সেনের মধ্যে)। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতীয় প্রামা-ণিকই জাপানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মেয়ে প্রামাণিকগণ সাধারণতঃ স্ত্রীলোক-দিগের কেশ বিন্যাস করিয়া থাকে। ইহারা গৃহস্থের বাটীতে যাইয়াও চুল

বন্ধন করিয়া দেয়। কোন কোন স্থানে ইহারা পুরুষ প্রামাণিকগণের ব্যবসায়ও খুলিয়া বসিয়াছে।

জাপানী স্ত্রীলোকদিগের কেশবিন্যাস সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। কেশ বন্ধনে জাপানী রমণীগণ অতুলনীয়। ইঁহারা যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রকমে কেশ বিন্যাস করিয়া থাকেন, জগতের অন্য কোনও জাতীয় স্ত্রীলোকেরা সেরূপ করেন বলিয়া বোধ হয় না।* জীবনের প্রথমাবস্থা হইতে শেষ পর্যান্ত প্রত্যেক জাপানী-রমণী যে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে কেশ বন্ধন করিয়া থাকেন তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? কেশই রমণীর

---

* এক এক প্রকারের কেশ বন্ধন অর্থাৎ খোঁপা এক এক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সচরাচর যে কয় প্রকার খোঁপা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার নাম নিম্নে দিলাম। ভূমিষ্ঠ হইবার পর পাঠশালায় যাইবার বয়স পর্য্যন্ত যে প্রণালীতে চুল কাটা এবং বাঁধা হইয়া থাকে তাহা পাঠকবর্গ দেখিয়াছেন। এই সময় হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সাধারণতঃ কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেশবিন্যাস হইয়া থাকে তাহা একবার দেখুন। ৭ বৎসর হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাগণ যেরূপভাবে কেশবন্ধন করে তাহার নাম 'ও সাগে' এবং 'ও তায়াই"। পাঠশালায় যুবতীগণ যে ভাবে কেশ বিন্যাস করেন তাহার নাম "নি হিয়াকু সান্ (২০৩) কোটি" এবং (এস্ ইংরাজি বর্ণ) 'এস মাকি')। সাধারণ যুবতীগণ বিবাহের পূর্ব্বে যেরূপ চুল বাঁধিয়া থাকে তাহার নাম (১) "চো চো" প্রজাপতির ন্যায় (২) "তেন জিনওয়াগে" এবং (৩) "তাকাসি মাদা"। যুবতী বিবাহ করিতে বর গৃহে গমনকালে যেরূপভাবে কেশ বিন্যাস করেন তাহার নাম "সিমাদা" আর তথায় উপস্থিত হইয়া যে ভাবে চুল বাঁধেন তাহার নাম 'মারু মাগে' বৃদ্ধাগণ যে ভাবে চুল বাঁধেন তাহার নাম "ইয়োকোবোরী"।

যুবতীগণের কেশ বন্ধন দেখিলেই তাহারা বিবাহিতা কি অবিবাহিতা তাহা বুঝা যায়। তবে আজকাল অনেকেই বিবাহের পরও বিদ্যালয়ের বালিকাগণের ন্যায় 'নি হিয়াকুসান্ কোচি' চুল বাঁধিয়া থাকেন। এই প্রকার কেশ বন্ধন ইউরোপিয়ান স্ত্রীলোক দিগের ন্যায়। জাপানী স্ত্রীলোকগণ শীঘ্রই টুপি ব্যবহার করিতে বন বলিয়া বোধ হয়।

প্রকৃতিদত্ত ভূষণ ; কিন্তু জাপানী-ললনাগণের ন্যায় অন্য কেহই ইহার সমুচিত যত্ন করিতে জানেন না ।।কেশের ভ্রমর-কৃষ্ণবর্ণ রক্ষিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিতে ইঁহারা বহু কষ্ট অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া থাকেন। ডিম্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কত প্রকার তৈল ইঁহারা মস্তকে মাখিয়া থাকেন তাহা ঠিক বলা যায় না। স্নান করিবার সময় পাছে ডিম্ব কিংবা তৈল ধৌত হইয়া যায়,এই আশঙ্কায় ইঁহারা মাসের মধ্যে দুই তিনবার মাত্র মস্তক ধৌত করিয়া থাকেন, অথচ 'ফুরো' অর্থাৎ স্নানাগারে ইঁহারা প্রায় প্রত্যহই যাইয়া থাকেন।

জাপানী ললনাগণ আমাদের দেশের রমণীগণের ন্যায় প্রত্যহ চুল বাঁধেন না ; ইঁহারা একবার যে চুল বাঁধেন তাহা এক সপ্তাহ কাল ঠিক সেইরূপ থাকে। তাহার কারণ এই যে, (১) স্নান করিবার সময় ইঁহারা ক্বচিৎ মস্তক ধৌত করেন (২) আমাদের দেশের পুরস্ত্রীগণের ন্যায় অবগুণ্ঠন জাপানে প্রচলিত নাই ; (৩) শয়ন করিবার সময় ইঁহারা বালিশ ব্যবহার করেন না। বালিশের পরিবর্ত্তে ইঁহারা একপ্রকার কাষ্ঠের 'মাকুরা' (কাষ্ঠের বালিশ বিশেষ) ঘাড়ের নিম্নে রাখিয়া শয়ন করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই 'মাকুরা' ব্যবহার শিক্ষা করিতে বালিকাগণের প্রথমতঃ অনেক কষ্ট পাইতে হয়। অনভ্যস্ততাহেতু প্রথমাবস্থায় ঘাড়ের যন্ত্রণায় অনেক দিন নিদ্রা যাইতে পারে না। বালিকার বয়স ১২।১৩ বৎসর হইলেই তাহাকে এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা দেওয়া হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ আনন্দময়ী, কোমলাঙ্গী, প্রকৃতিদেবীর ক্রোড়ে আশ্রিতা এবং পালিতা জাপবালিকার এই অবশ্যম্ভাবী কষ্টে সহৃদয় পাঠকবর্গের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু নিজের ঘরের কথা মনে পড়িলে দেখিতে পাইবেন যে,আমরা জাপানীদের অপেক্ষাও অধিক নির্দ্দয় এবং পাপী। অলঙ্কার পরাইবার জন্য আমরা ছোট ছোট বালিকাগণের নাসিকা এবং কর্ণ ছিদ্র করিয়া কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই দিয়া থাকি! গহনাদ্বারা স্ত্রীলোকদিগকে কৃত্রিমভাবে সাজাইতে গিয়া তাঁহাদের প্রকৃতি-দত্ত সৌন্দর্য্য-

টুকুও নষ্ট করা হয়; অধিকন্তু অজস্র মুদ্রা নিরর্থক প্রতি গৃহে বদ্ধ হইয়া থাকে। এই অনাবশ্যক বস্তুর জন্য অসংখ্য পরিবার ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অলঙ্কার দ্বারা রমণীগণকে সাজাইবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বর তাঁহাদের সৃষ্টি করেন নাই; যদি তাঁহার এই অভিপ্রায় থাকিত তাহা হইলে তিনি হিন্দুরমণীগণের নাসিকা এবং কর্ণ তদনুসারে গঠন করিতেন!

ঋতু চতুষ্টয়।

জাপানে চারিটি ঋতু আছে। সূক্ষ্মভাবে ধরিতে গেলে সেখানেও আমাদের দেশের ন্যায় ছয়টি ঋতু স্পষ্ট বুঝা যায়। বর্ষা এবং হেমন্ত ঋতুর উল্লেখ জাপানীদের কোন পুস্তকে না থাকিলেও এবং এই দুইটি ঋতুকে জাপানীরা গ্রীষ্ম এবং শরৎ ঋতু হইতে স্বতন্ত্র মনে না করিলেও, সেখানে এই দুইটির অস্তিত্ব বেশ অনুভূত হয়। তবে এই দুইটিই অল্পদিন স্থায়ী। গ্রীষ্মকালের শেষভাগে সেখানে ২।৩ সপ্তাহ কাল প্রায় সর্ব্বত্র বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সময়টিকে বর্ষাকাল বলা যাইতে পারে; কিন্তু জাপানীরা উহাকে গ্রীষ্মকালের মধ্যেই গণনা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, প্রথমতঃ,উহা অল্পকাল-স্থায়ী, দ্বিতীয়তঃ বৃষ্টি সেখানে প্রায় সমস্ত ঋতুতেই অল্পাধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। মোটের উপর জাপানে শতকরা ২৫ দিনের অধিক বৃষ্টি হয়। বর্ষাকালের ন্যায় হেমন্ত কালও অল্পস্থায়ী হওয়ায় উহা শরৎ ঋতুর মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

জাপানের ঋতু চারিটার প্রধান বিশেষত্ব নিম্নে বর্ণিত হইল। 'নাৎসু' অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে প্রায় বঙ্গদেশের ন্যায়ই গরম পড়িয়া থাকে। এই সময়ে জাপানে বাতাস অতি মৃদু গতিতে প্রবাহিত হওয়ায় ইহা মানুষের গায়ে প্রায়ই লাগে না এবং এই কারণেই দিবারাত্রি সমান গরম অনুভূত হয়। রাত্রিতে গাত্রোপরি একখানি পাতলা চাদর পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। গ্রীষ্মকালে মশার দৌরাত্ম্য বড় ভয়ানক। জাপানের মশা অপেক্ষাকৃত বড় এবং সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক। বাড়ী একতালা হউক আর দোতালা হউক, পরিষ্কৃত হউক

আর অপরিষ্কৃত হউক, মশা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। মশার দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাপানীরাও মশারির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই মশারিগুলি প্রায়ই বৃহদাকার। সমস্ত ঘর জুড়িয়া মশারি খাটান হইয়া থাকে। মশারিগুলি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমান। মশা ঘর হইতে বাহির করিবার জন্য জাপানীরা এক প্রকার কাষ্ঠ জ্বালাইয়া তাহার ধূম ঘরের মধ্যে দিয়া থাকেন। এই কাষ্ঠের নাম 'জোটিউ কিকু নো কি' অর্থাৎ স্ত্রীজাতীয়* কিকু ফুলের গাছ। এতদ্ব্যতীত গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে আর একটী উপদ্রব ভোগ করিতে হয়। সেটী এই :—'নমি' নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা আছে। ইহা দিবাভাগে 'তাতামীর' মধ্যে লুকায়িত হইয়া থাকে, এবং রাত্রিকালে বাহির হইয়া নিদ্রার বড়ই ব্যাঘাত জন্মায়। শুষ্ক তৃণ কিংবা খড় বেশ পুরু করিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর মাদুর বিস্তৃত করিয়া চতুর্দ্দিক কাপড় দ্বারা মণ্ডিত করা হয়। ইহাকেই 'তাতামী' বলে। এই তাতামী মাদুরের কাজ করে এবং উহা দ্বারা জাপানীদের ঘরের (measure) মাপ করা হয়। এই পোকার দৌরাত্ম্য অসহনীয়। উহার উপর চপেটাঘাত করিলেও উহার কোন অনিষ্ট হয় না। অনেক সময়ে এমনও দেখা গিয়াছে যে, একটী 'নমি'কে ধরিয়া অনেক্ষণ অঙ্গুলি দ্বারা টিপিবার পরও উহা অনায়াসে উড়িয়া যায়। জাপানের পুরাতন বাটীমাত্রেই 'নমি' অসংখ্য পরিমাণে বাস করে। নূতন 'তাতামি'তে উহার সংখ্যা কিছু কম। উহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য জাপানীরা এক প্রকার গুড়া ব্যবহার করেন। এই গুড়াকে 'নমিতরি নো কো' (অর্থাৎ নমি মারিবার গুড়া) বলে। বিছানার চারিদিকে ছড়াইয়া দিলে 'নমি'গণ ইহার গন্ধে

---

* ('জোটিউ'—স্ত্রীজাতি, 'কিকু'—একপ্রকার ফুল, ইংরাজীতে ইহাকে Crysan thamum বলে। জাপানীরা এই ফুলকে অত্যন্ত ভালবাসেন। এই ফুলের উৎসব প্রতিবর্ষে হইয়া থাকে। 'কি'—বৃক্ষ)।

মুগ্ধ হইয়া যেমন ভক্ষণ করে অমনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব সময়ে যেখানে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" ছিল, এক্ষণে সেইখানে সহস্র সহস্র জীব প্রত্যহ বিনা কারণে হত হইতেছে; কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন!

'আকি' অর্থাৎ শরৎকালকে জাপানীরা বসন্তকালের ন্যায় ভালবাসেন। কারণ তখন জাপানে নানাপ্রকার ফল পাওয়া যায়। এই সমস্ত ফলের বৃক্ষ কিংবা বীজ অধিকাংশ স্থলেই বিদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। আমাদের দেশীয় ফলের মধ্যে জাপানে তরমুজ, ন্যাস্, কাঁকুড়, বাতাবী ও কমলা ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে শেষোক্ত ফলটীর এবং অন্যান্য অনেক ফলের বীচি একেবারেই জন্মিতে পারে না। কৃষিতত্ত্বজ্ঞ জাপানীদের যত্নে ফলগুলি বেশ পরিপুষ্ট হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কোনও বৃক্ষ জাপানে জন্মে না। এই জন্যই জাপানীদের বহু যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের আম ও কাঁঠালের গাছ সেখানে নাই। এই সময়ে নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এবং অনেক বৃক্ষের পত্র লোহিত বর্ণ ধারণ করায় এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের অভিনয় হয়। পর্ব্বতোপরি কিংবা উপত্যকায় এই সমস্ত বৃক্ষের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রায়ই বহুসংখ্যক বৃক্ষ একস্থানে ঘন হইয়া জন্মিয়া থাকে। তাহাদের পত্রসমূহ শরৎকালে এমন লাল হয় যে হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন সেখানে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত রহিয়াছে। জাপানীরা এই দৃশ্যটীকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং ইহা উপভোগ করিবার জন্য দলে দলে পর্ব্বতারোহণ করিয়া থাকেন। এই সময়ে আর একটী বস্তু জাপানীদের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে। সেটী এই যে শরৎ সমাগমে পর্ব্বতের গায়ে এক প্রকার mushroom জন্মে, সাধারণতঃ আমারা যাহাকে ব্যাঙের ছাতা বলি, ইহা ঠিক তাহারই ন্যায়; তবে এগুলির জন্মস্থান পর্ব্বতোপরি। ইহা জাপানীদের অতি উপাদেয় খাদ্য। অনেক সৌখীনলোক এই সময়ে mush-

room শিকারার্থে পর্ব্বতোপরি গমন করেন। একদা আমার জনৈক জাপানী পরিচিত ব্যক্তি আমাকে mushroom hunting এ যাইবার অনুরোধ করিলে আমি 'hunting' শব্দের অর্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, mushroom গুলি বৃক্ষপত্র কিংবা তদনুরূপ অন্য কোনও বস্তুদ্বারা সাধারণতঃ আচ্ছাদিত থাকায় সহজে তাহাদিগকে দেখা যায় না। তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় বলিয়া আমরা hunting শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি।

বঙ্গদেশে শীতকালে যেরূপ শীত, জাপানে শরৎ ও বসন্তকালে ঠিক সেইরূপ শীত পড়িয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শরৎকালে প্রায়শঃ প্রবল বাতাস প্রবাহিত হইয়া থাকে।

শীতকালকে জাপানীরা 'ফুয়ু' বলে। ডিসেম্বর মাস হইতে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত জাপানে শীতের প্রকোপ পরিদৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে যেমন উত্তাপের প্রাখর্য্য, শীতকালে সেইরূপ শীতের আধিক্য। তাপমান যন্ত্র অনেক স্থানেই Freezing point পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে এবং প্রায় প্রতি রাত্রিতে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। জাপানের উত্তরাংশে শীতের প্রারম্ভ হইতে বসন্তাগম পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহ তুষারপাত হয়। কোবে, কিয়োতো, ওসাকা, তোকিও প্রভৃতি স্থানে তুষাররাশি একহস্ত পরিমাণ উচ্চ হইয়া থাকে।

তুষার পতনের সময় বোধ হয় যেন শুভ্র আকাশ তুলার আঁশের ন্যায় ঝরিয়া খসিয়া পড়িতেছে। গৃহের ছাদ,বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা ও পত্রসমূহ এবং রাস্তা ঘাট, পর্ব্বতাদি তুষারাবৃত হইলে বোধ হয় যেন বসুন্ধরা জীবকুলের পাপ এবং কলঙ্ক হইতে বিমুক্ত হইয়া শুভ্রবাস পরিধান করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সময় প্রকৃতি যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। বৃষ্টি কিংবা কুজ্ঝটিকার সহিত তুষারপাতের কোনও সাদৃশ্য নাই। কারণ বর্ষণের আড়ম্বর অনেক, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আছে, মেঘের

গর্জ্জন আছে। কিন্তু তুষার পতনের সময় প্রকৃতির সমস্তই নিস্তব্ধ। বৃষ্টি ও কুয়াসা অধিকাংশস্থলেই মনকে চিন্তাকুল করিয়া তুলে এবং সেই কারণেই মানুষের বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু তুষারপাতে মনে যে বিমল আনন্দ উপস্থিত হয় তাহা প্রাকৃতিক অন্য কোনও সুদৃশ্য দেখিয়া হয় কিনা জানি না। আমি অনেক প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়াছি, কিন্তু কোনটীতেই এমন শান্তি এবং সুখ সমভাবে অনুভব করিতে পারি নাই।

ডিসেম্বর এবং জানুয়ারির অপেক্ষা ফেব্রুয়ারি মাসের শীত জাপানে নিতান্তই অসহনীয়। ঐ সময়ে বাতাস প্রবলবেগে প্রবাহিত হওয়ায় এবং সময়ে সময়ে তুষারপাত হওয়ায় শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তুষার পতনের সময় শীত অপেক্ষাকৃত কম হয়। কিন্তু উহার পতন শেষ হইলে অত্যন্ত শীত পড়িয়া থাকে। এই নিদারুণ শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাপানীরা ৩। ৪ খানা 'কিমোনো, (পরিধেয় বস্ত্র) পরিধান করিয়া থাকেন। 'কিমোনো' গুলির মধ্যে আমাদের দেশের 'বালাপোসের ন্যায় তুলা থাকায়, উহা অত্যন্ত গরম। এতদ্ব্যতীত গৃহই হউক আর কাছারীই হউক, সর্ব্বত্রই আগুনের বন্দোবস্ত আছে। শীতকালে জাপানীদের বাটীতে বেড়াইতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে আগন্তুককে অগ্নি প্রদান করা হয়। তৎপরে দেশাচার অনুসারে "ওচা" দেওয়া হইয়া থাকে।

রাত্রিতে শয়নকালে ২।৩ খানি লেপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের বঙ্গদেশে শীতকালে যেরূপ লেপ ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ দুইখানি লেপ একত্র করিলে যেমন পুরু হয়, জাপানীদের লেপ তাহার অপেক্ষাও পুরু। বলিতে গেলে জাপানীরা শীতকালে আমাদের দেশের ৫।৬ খানি লেপ গায়ে দিয়া থাকেন। এই গেল গায়ের উপরের ব্যবস্থা। নীচে পাতিয়া শুইবার ব্যবস্থাও এইরূপ। জাপানে খাট কিংবা চৌকির প্রচলন না থাকায় তদ্দেশীয় লোকেরা 'তাতামী'র উপর ২।৩ খানি পুরু তোষক পাতিয়া তদুপরি শয়ন করিয়া থাকেন।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, জাপানের লেপ কিংবা তোষকের 'ওয়াড়' (cover)নাই। এমন কি অধিকাংশ স্থলেই বিছানার চাদর পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় না। বিছানা গরম রাখিবার জন্য জাপানীরা উহার ভিতরে 'কোতাৎস্থ' (অর্থাৎ অগ্নি পাত্র বিশেষ) রাখিয়া থাকেন। এই "কোতাৎসু'গুলি সাধারণতঃ মৃত্তিকানির্ম্মিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা সমান। কোনও দিকেই এক ফিটের অধিক হইবে না। ইহার চতুর্দ্দিকেই জানালার ন্যায় মুখ। ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে কোনও প্রকার ফাঁক নাই। এই মুখগুলি দিয়া 'কোতাৎসু'র মধ্যে আগুন দেওয়া হয়। আগুন রাখিবার জন্য একটী মাল্সার ন্যায় মৃত্তিকা পাত্রে ভস্ম পুরিয়া তাহার মধ্যে কয়লার কিংবা গুলের আগুন ঢাকিয়া রাখা হয়। এই আগুন প্রায় সমস্ত রাত্রি সমান ভাবে থাকে।

বিছানার মধ্যস্থিত এই 'কোতাৎসু' ব্যবহার করা সর্ব্বস্থানে এবং সকল সময়ে নিরাপদ নহে। একদা উহা ব্যবহার করিতে গিয়া আমি বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছিলাম। শৈশবাবস্থা হইতে জাপানীরা 'কোতাৎসু' ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ায় উঁহারা বিপদের আশঙ্কা বড় একটা করেন না, কিন্তু আমি এ বিষয়ে একেবারেই অনভ্যস্ততা হেতু দুই পায়ের মধ্যস্থলে উক্ত অগ্নিপাত্র লইয়া শয়ন করায় আমার সুখানুভব হওয়া দূরে থাকুক অগ্নিকুণ্ডটি আমার পক্ষে গভীর অশান্তির কারণ হইয়াছিল। নিদ্রিতাবস্থায় পাশ ফিরিবার সময়ে আমার একটি পা 'কোতাৎসুর' মুখের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য অগ্নিপাত্রটি তৎক্ষণাৎ শয্যায় গড়াইয়া পড়ায় নিমেষ মধ্যে বিছানার চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া পড়িল। সেই দণ্ডে নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম আমার পার্শ্বস্থ ঘরের জনৈক জাপানী বন্ধু আমার বিকট চীৎকার (জাপানীরা কখনও বড় করিয়া চীৎকার করেন না; সুতরাং আমার কর্কশ চীৎকার তাঁহাদের নিকট বিকট প্রতিপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক) শুনিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন। বিপদের সময়েও তাঁহাকে হাসিতে

দেখিয়া আমি গাম্ভীর্য্য ধারণ করিলে তিনি আরও হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,বিপদ কাহাকে বলে মহাশয় ? আমি একটু লজ্জিত হইলাম,দেখিলাম অগ্নি কোথাও প্রজ্বলিত হয় নাই, উহা কেবল বিছানার স্থানে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়া 'নমি' এবং 'নান্‌কিন মুসীর' (ছারপোকার) ধ্বংস করিতেছে। যাহা হউক, আগুন শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইল এবং ভস্মগুলি কুড়াইয়া বিছানা ঝাড়িয়া হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আবার নিদ্রা গেলাম।

শীতকালে আমাদের খাদ্যোপযোগী ফলমূল এবং তরিতরকারী জাপানে অতি কমই পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে 'রিঙ্গো' (apple) এবং মিকান্ (কমলা লেবু) প্রধান। কিন্তু তরকারী অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। তবে গোল আলু সব সময়েই পাওয়া যায়। শীতের প্রকোপ অত্যন্ত প্রবল বলিয়া ঐ সময়ে কফি ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে না, সুতরাং উহা অত্যন্ত মহার্ঘ।

'হারু' অর্থাৎ বসন্ত কাল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই ঋতুটীকে জাপানীরা জগতের অন্যান্য সকল দেশের লোকের ন্যায় অত্যন্ত ভালবাসেন। কিন্তু ইঁহাদের ভালবাসার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বটুকু যে কি তাহা আমি পাঠকবর্গকে কিরূপে বুঝাইব ! যাঁহারা জাপানে যাইয়া জাপানীদের মুখে বসন্তের গুণ বর্ণনা না শুনিয়াছেন এবং বসন্তাগমে তাঁহারা কিরূপ প্রফুল্ল ও আহ্লাদিত হন তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহা বুঝান সুকঠিন। বসন্তাগমে জাপানে নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু পাঠকবর্গ শুনিলে অবাক্ হইবেন যে গোলাপের আদর জাপানে সেরূপ নাই, কারণ গোলাপ রঙ্গিন এবং গন্ধ বিশিষ্ট। জাপানীরা সাদা, সরল এবং গন্ধবিহীন ফুল ভালবাসেন এবং এই কারণেই 'কিকু' এবং 'সাকুরা' (cherry) ইহাদের অতি প্রিয় বস্তু। 'কিকু' সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'সাকুরা' ফুল তত বড় হয় না। উহা বসন্তাগমে ফুটিয়া থাকে। এই সময়ে ফুলসহ গাছগুলি ছাঁটিয়া নানারূপ মনোমোহনকর আকারে পরিণত করা হয়।

কৃত্রিম উপায়ে পুষ্প-শাখা রক্ষণ।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

ইহা দেখিবার জন্য ইউরোপ এবং আমেরিকা হইতে প্রতি বৎসর অসংখ্য লোক জাপানে গমন করিয়া থাকেন। কিয়োনগরীতে একটী প্রাচীন সাকুরা ফুলের গাছ আছে। ঐখানে প্রতি বৎসর বসন্তকালে অতি সমারোহের সহিত একটী মেলা হয় এবং সহরের নানাস্থানে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে এক প্রকার নৃত্যের বন্দোবস্ত করা হয়, উহাকে 'নিয়া কোদরী' বলে। এই নৃত্যে এক সঙ্গে ৬০।৬৫ জন নর্ত্তকী যোগদান করিয়া থাকে। নর্ত্তকীগণ নিজেরাই গীতবাদ্য প্রভৃতি সমস্ত সম্পন্ন করেন। ইহাতে কোনও পুরুষ মানুষ নাই।

শরৎ এবং বসন্তকালে জাপানের প্রায় সর্ব্বত্র এই ফুলের প্রদর্শনী খেলা হয়। শরৎ ঋতুতে আমি একটী প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। ফুলসহ 'কিকু' গাছ দ্বারা ঘোড়া, মানুষ, পাখী, পাতা, পাহাড়, পুষ্করিণী ইত্যাদি সমস্তই অতি পরিপাটীরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। জাপানী সামুরাইগণের (পুরাকালীন যোদ্ধা) প্রতিমূর্ত্তি এবং তাঁহাদের পোষাক পরিচ্ছদ যাঁহাদের দেখিবার ইচ্ছা থাকে তাঁহারা যেন এই সকল ফুলের প্রদর্শনী দেখিতে না ভুলেন। পুরাকালীন জাপানী রমণীদের বেশ ভুষা এবং কেশবন্ধন কিরূপ ছিল, তাহাও প্রদর্শনী দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বসন্তকালেও মধ্যে মধ্যে ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সময়ে অনেক জিনিষই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

জাপানী ভাষা।

জাপানী ভাষার বর্ণ (Alphabet) প্রধাণতঃ তিন প্রকার। কাতা-কানা, হিরাকানা, এবং *হংজি। 'মেজি' অব্দের পূর্ব্বে আর এক প্রকার বর্ণ প্রচলিত ছিল। ইহাকে 'চুকানা' বলা হইত। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে জাপানের শিক্ষাপরিষদ পাঠশালা হইতে ইহার প্রচলন উঠাইয়া দিয়াছেন। চিঠি পত্রাদিতে এই শ্রেণীর অক্ষর আজ পর্য্যন্তও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জাপানীদের নিজেদের কোনও লিখিত ভাষা ছিল না। চীন এবং কোরিয়া দেশ হইতে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশীয় ভাষা জাপানে প্রচলিত হয়। এই ভাষাতেই পুস্তকাদি লিখিত হইয়া আসিতেছে। এই 'হংজির' সংখ্যা তিন সহস্রের উপর। ইহার অক্ষরগুলি অতি জটিল এবং শিক্ষা করিতে অনেক সময়ের দরকার। চীন ভাষায় অক্ষর এবং হংজি এক হইলেও উহাদের উচ্চারণ এবং অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই হংজির একই অক্ষর পৃথক পৃথক শব্দের সহিত যুক্ত হইলে ভিন্ন ভিন্নরূপে পঠিত হয় এবং তাহার অর্থও ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। বলা আবশ্যক যে এই হংজির প্রত্যেক অক্ষরই এক একটী শব্দবিশেষ।

হংজি শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন বিধায় 'কিবিয়াকিবি' নামক জনৈক পণ্ডিত 'কাতাকানা'র উদ্ভাবন করেন। ইহা জটিলতর হংজি হইতে সহজাকারে লিখিত এবং ইহার সংখ্যা সর্ব্বসমেত সাতচল্লিশটী মাত্র।

এই অক্ষরগুলি দেখিতে তেমন সুন্দর না হওয়ায় 'কোবোদাইসি'

---

* হংজি—হং অর্থ পুস্তক, জি অর্থ অক্ষর। হংজি অর্থ—যে অক্ষরে পুস্তক লিখিত হয়।

(Kobodaishi) নামক জনৈক সংস্কৃতাভিজ্ঞ‡ বৌদ্ধ পুরোহিত 'হিরাকানা'র প্রচলন করেন। এই হিরাকানার অক্ষরগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর এবং সংস্কৃত অক্ষরের সহিত অনেক স্থলে ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আধুনিক সমস্ত সংবাদপত্র এবং পুস্তকে হংজির দক্ষিণপার্শ্বে হিরাকানাও লিখিত হইয়া থাকে। এই হিরাকানার সংখ্যা সাতচল্লিশটী মাত্র। সুতরাং হংজি না জানিলেও আধুনিক পুস্তকাদি পাঠ করা কঠিন নহে।

জাপানী ভাষায় ব্যাকরণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃত কিংবা অন্য কোনও ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে যেমন ব্যাকরণ শিক্ষা অনিবার্য্য, জাপানী ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে তেমনি 'হংজি'র আয়ত্ত করিতে হয়। যিনি যত অধিক হংজি জানেন, তিনি তত অধিক শিক্ষিত। সমুদয় 'হংজি' জানেন এমন লোক জাপানে খুবই কম। ভাষার এইরূপ জটিলতা এবং অসম্পূর্ণতা দেখিয়া 'মেজি' গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র এক প্রকার 'কানা' অথবা ইংরাজি অক্ষর প্রচলন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইলে ভাষার অনেক দোষ হইতে পারে এই আশঙ্কায় উক্ত প্রস্তাবটী আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে। সুতরাং 'চুকানা' ব্যতীত অন্য তিন প্রকার অক্ষরই এখনও পর্য্যন্ত পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শতকিয়া ইত্যাদি অঙ্কপাত সমস্তই ইংরাজিতে লিখিত হইয়া থাকে। জাপানীদের ইংরাজি শিখিবার যেরূপ আগ্রহ দেখা যায় তাহাতে বোধ হয় অচিরে ইহারা ইংরেজীকেই জাতীয় ভাষা করিয়া লইবেন। পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ অর্থাৎ কোট প্যাণ্টেলুন পরিধান করিয়া কাজ করা সুবিধাজনক বলিয়া জাপানে উহার যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে। সমস্ত

‡ বৌদ্ধপুরোহিতগণের শিক্ষার জন্য কিয়োতোনগরে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে।

গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীই সাহেবী পোষাক ব্যবহার করিতে আইনানুসারে বাধ্য।

বলা বাহুল্য, আধুনিক জাপানীরা স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই স্বল্পবিস্তর শিক্ষিত; এতদ্ভিন্ন বৈদেশিক বিশেষতঃ পাশ্চাত্য ভাষাভিজ্ঞ জাপানীর সংখ্যা শতকরা হিসাবে গণনা করিলে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহাতেই বুঝা যায় জাপানীদের উদ্যম কত।

ইংরাজি, জার্ম্মাণ, ফ্রেন্স্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ শুধু শিক্ষা করিয়াই জাপানীরা ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা ঐ সমস্ত ভাষার ভাল ভাল পুস্তকগুলি নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের জ্ঞানের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। চিকিৎসা এবং শিল্প সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পুস্তক জার্ম্মাণ ভাষায় যেরূপ আছে অন্য কোনও ভাষায় সেরূপ নাই। এই কারণেই জাপানীরা জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য অন্যান্য ভাষা সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।

পুরাকালে জাপানীরা ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন। ফলে ভারতবাসীদের ন্যায় এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারিতেন না। 'মেজি' অব্দের প্রারম্ভ হইতে একই ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলন করায় উপরোক্ত অসুবিধা তিরোহিত হইয়াছে। আমাদের দেশে কি এরূপ কিছু হওয়া অসম্ভব, যদ্দারা আমরাও জাপানীদের ন্যায় একই ভাষা বলিতে ও বুঝিতে পারি? একই দেশবাসী হইয়া এক প্রদেশের লোক আর এক প্রদেশের ভাষা বুঝিতে পারি না, ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? একই সংস্কৃত ভাষাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বিভক্ত করিয়া আমাদের মধ্যে যেটুকু একতা ছিল তাহাও ছিন্ন করিয়া দিয়াছি। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে বাঙ্গালা সাহিত্যে যাহা আছে, হিন্দুস্থানী বা মারহাট্টীতে তাহা নাই। আবার তাহাতে যাহা আছে আমাদের ভাষায় তাহা নাই। সংস্কৃত অক্ষরগুলি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন

অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া আমরা দেশের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা দেখিতে পাইতেছেন!

ইংরাজি শিক্ষা—যাক্, ও সব কথায় আমাদের কাজ নাই। যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষার পথে জাপানীদের কতকগুলি অন্তরায় আছে। জাপানী ভাষায় অসংখ্য অক্ষর থাকিলেও তদ্দারা অধিকাংশ বিদেশীয় ভাষার শব্দ লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জাপানীরা বিদেশীয় অনেক শব্দ মুখে পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারেন না। সংস্কৃত কিংবা বাঙ্গালা অক্ষরদ্বারা আমরা জগতের সমুদয় ভাষার যাবতীয় শব্দ লিখিতে পারি; কিন্তু জাপানীদিগকে (Beer Hall) 'বিয়ার হল' লিখিতে বলিলে তাঁহারা 'বিরু হরু' লিখিয়া বসিবেন। র কিম্বা ল উচ্চারণ করিবার উপযুক্ত কোনও অক্ষর তাঁহাদের ভাষায় না থাকাই ইহার কারণ। রা, রি, রু, রে, রো আছে কিন্তু র শব্দটী নাই। ল কিম্বা ইংরাজী এল (L) জাপানীরা উচ্চারণই করিতে পারেন না। ড় কিম্বা ঢ় উচ্চারণ করিতে বলিয়া আমি অনেকবার তাঁহাদিগকে ফাঁপরে ফেলিয়াছি! এই সমস্ত স্বাভাবিক অন্তরায় সত্ত্বেও জাপানীরা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। জাপানের যুবক যুবতীগণের বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার প্রতি কিরূপ অনুরাগ তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইঁহারা ভাষা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বিদেশীয়দের বাড়ীতে অতি সামান্য বেতনে দাস দাসী বৃত্তি করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। বরং উহা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করেন। আমি কয়েকজন ভদ্রমহিলাকে ভাষা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বিদেশীয়দিগের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতে দেখিয়াছি। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের নিকটও অনেক যুবক যুবতী ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আমরা তাঁহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারি না বলিয়া তাঁহারা আমাদের Association,

Clubs, ইত্যাদিতে যোগদান করিয়া ইংরাজি বলিবার অবসরটুকু করিয়া লন। তাঁহাদের হৃদয়ে যেমন উৎসাহ তেমনই বল।

জাপানীদের ভাষার সহিত ইংরাজীর কোনও সাদৃশ্য না থাকায় তাঁহাদিগকে ইংরাজি শিক্ষা করিতে অনেক অসুবিধা বোধ করিতে হয়। কিন্তু তাঁহাদের একটী মহৎ গুণ এই যে ভুলই হউক আর ঠিকই হউক, ইংরাজি লিখিতে বা বলিতে তাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্কুচিত নহেন। ইংরাজি জাপানীদের হাতে পড়িয়া ব্যাকরণের কঠোর শাসন হইতে মুক্তি পাইয়াছে। সাধারণ অর্দ্ধশিক্ষিত জাপানীরা কিরূপ ইংরাজি লিখিয়া থাকেন নিম্নে তাহার নমুনা প্রদত্ত হইল।

(TRUE COPY)

"My dear Gose Esq

I heard your sickness from servant in the way, I hope to ask your sickness sooner,but lately I am very business.

Pardon me, be careful it is too cold.

Your friend

(Sd.) K. Ueda."

এতদ্ব্যতীত বাজারে বাহির হইলে নানা প্রকার Sign Boards দোকানের উপর বিলম্বিত দেখা যায়। অধিকাংশস্থলেই বানানের ভুল বা আসলেই ভুল। উদ্দেশ্য সাধন হইলেই হইল, ভাষার দোষগুণে ইঁহাদের কি আসে যায়? কোথাও বা নাপিতের দোকানে Hair cutter না লিখিয়া Head cutter লিখিয়া বসিয়া আছে! ইংরাজিতে কোনও প্রশ্নের 'হাঁ' কিংবা 'না' উত্তর দিতে হইলেই জাপানীদের গোল বাধিয়া যায়। সাধারণতঃ ইঁহারা হাঁ স্থানে 'না' এবং 'না' স্থানে 'হাঁ' বলিয়া উত্তর দিয়া থাকেন।

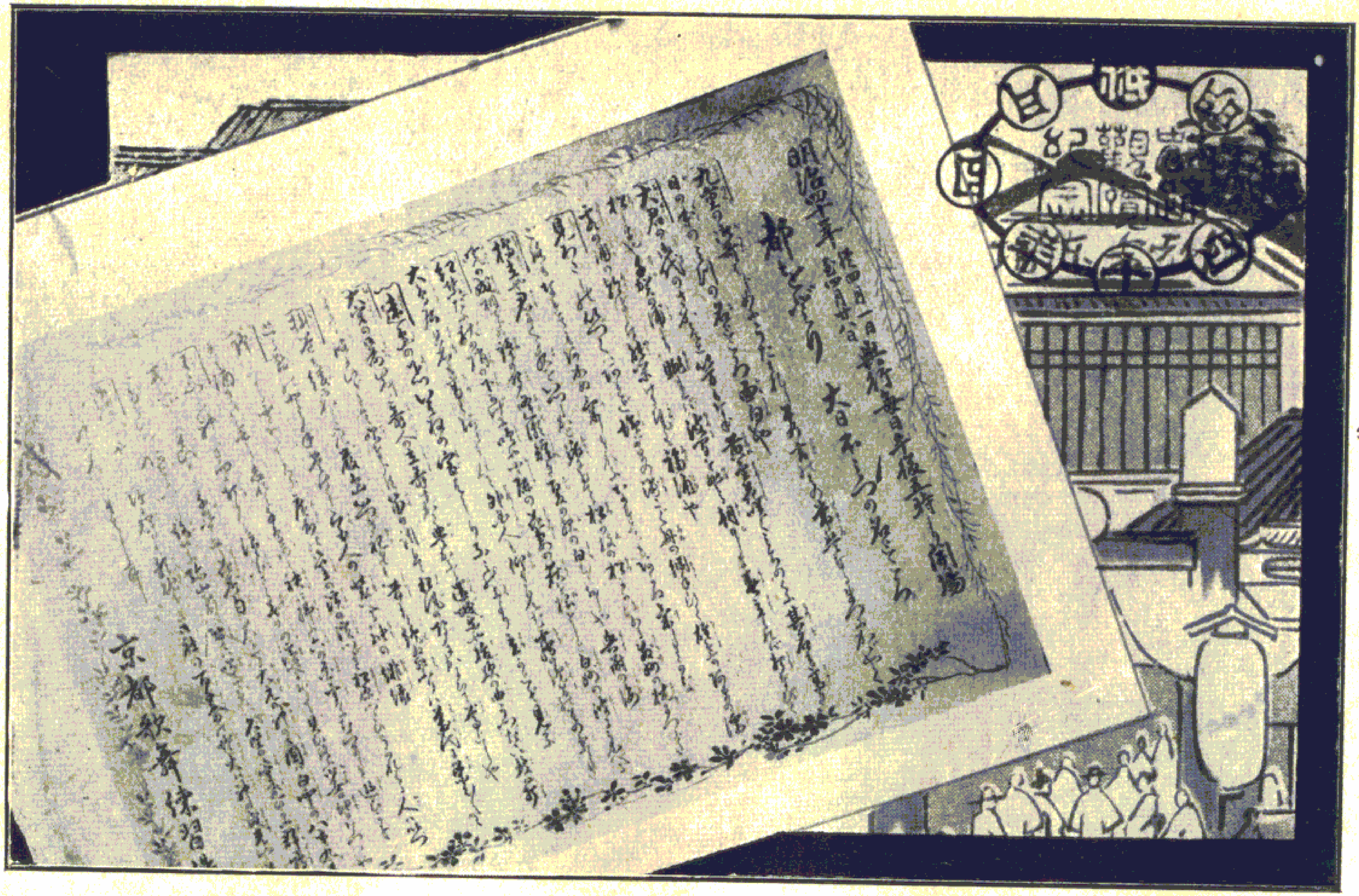

জাপানী অক্ষরের প্রতিলিপি।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

নিজেদের ভাষায় প্রশ্নোত্তর এই ভাবে দিতে অভ্যস্থ হওয়ায় সহসা বক্তার মুখ হইতে এরূপ উত্তর বাহির হইয়া পড়ে।

ভাষা ও ব্যাকরণ—জাপানী এবং চীন ভাষায় বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম পদের লিঙ্গ ও বচনের প্রভেদ নাই। তবে কতকগুলি বিশেষ্যপদ আছে যাহা স্বভাবতঃই স্ত্রী কিংবা পুরুষ বুঝায়। যথা, 'ইমোতো' (কনিষ্ঠা ভগ্নী), 'ওতোতো' (কনিষ্ঠ ভ্রাতা)। জাপানী ভাষায় লিঙ্গ এবং বচন না থাকায় ক্রিয়ার বিন্যাস সর্ব্বত্রই একইরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালবোধক প্রত্যয়, ক্রিয়ার শেষে সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত বাচ্যপরিবর্ত্তনের অনুযায়ী ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্যও হইয়া থাকে।

লাটিনের ন্যায় চীন ও জাপানী ভাষাতেও সর্ব্বনাম পদ অতি কমই ব্যবহৃত হয়। চীন ভাষায় একই শব্দ বিশেষণ এবং ক্রিয়ার বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হয়; কিন্তু জাপানী ভাষায় বিশেষণের শেষে 'নি' এবং 'তো' প্রত্যয় করিয়া ক্রিয়ার বিশেষণ করা হয়। এইখানে জাপানী ভাষার সহিত ইংরাজি, ফ্রেন্স, সংস্কৃত এবং বাঙ্গালার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

Construction of Sentence সম্বন্ধে জাপানী ভাষার সহিত বাঙ্গালার অতি নিকট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইংরাজি কিংবা চীন ভাষার সহিত ইহার কোনও সাদৃশ্য নাই। যথা, English—I can not go (আমি পারি না যাইতে); জাপানী—I go can not (আমি যাইতে পারি না)। অতএব পাঠকবর্গ দেখিতেছেন যে শেষোক্ত Sentenceটী ঠিক্ বাঙ্গালা বা সংস্কৃতের ন্যায়। আর একটী উদাহরণ দিতেছি ইহাতে চীন ভাষার সহিত ইংরাজীর অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে; কিন্তু জাপানী ভাষার সহিত আদৌ সাদৃশ্য নাই। এখানেও জাপানী ভাষার সহিত সংস্কৃতের বা বাঙ্গালার সাদৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়; যথা English and Chinese—I eat rice;

ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু জাপানীতে সংস্কৃত বা বাঙ্গলার ন্যায় কর্ম্ম ক্রিয়ার পূর্ব্বে আসিয়া বসে ; যথা—আমি ভাত খাই ('ওয়াতাকুশি গা গোহান ও তাবেমাস্থ')।

চীন ভাষার অক্ষর জাপানীতে গৃহীত এবং বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইলেও জাপানী ভাষার সহিত সংস্কৃত, কোরিয়ান, মঙ্গোলিয়ান, এবং মাঞ্চুরিয়ান ভাষার যেমন সাদৃশ্য আছে চীন ভাষার সহিত তাদৃশ নাই।

সাহিত্য জগতে জাপানী ভাষার স্থান আদৌ নাই বলিলেও চলে। জাপানীদের নিজেদের কোনও আদিম লিখিতভাষা না থাকায় উহা ক্রমশঃ এশিয়ার অন্যান্য সভ্যদেশের ভাষার সহিত জড়িত হইয়াছে।

* কুশা,দান্না, প্রভৃতি অনেক শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার সহিত জাপানী ভাষার অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকিলেও পুস্তকাদি পারসিক ভাষার ন্যায়:শেষ দিক্ হইতে লিখিত হয়। কিন্তু পারসিক ভাষার লাইনগুলি যেমন দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে Horizontally লেখা হয় জাপানী ভাষার সেরূপ না হইয়া পাঠকের বা লেখকের দক্ষিণদিক হইতে নিম্নদিকে লিখিত হয়। এই সোজা লাইনগুলি ক্রমশঃ বামদিকে চলিতে থাকে।

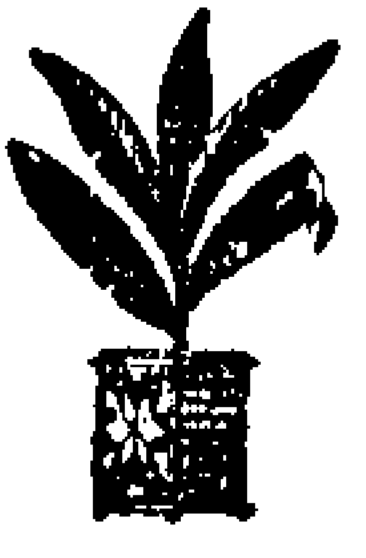

* একজন ভাষাতত্ত্ববিদ্ জাপানী পণ্ডিত প্রায় সহস্রাধিক সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত

স্ত্রী-চরিত্র।

———:**:———

এই বিষয়ের আলোচনা বিদেশীয়দের, বিশেষতঃ বঙ্গীয় হিন্দুদিগের পক্ষে সুকঠিন। কারণ, আমাদের দেশে স্বাধীন স্ত্রীলোকদিগের গতিবিধি অধিকাংশ স্থলেই দোষাবহ বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে; সুতরাং তদ্দেশীয় লোকেরা আমাদের অপেক্ষা সহজে জাপানী স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃত চরিত্র বুঝিতে পারেন। অতএব এ সম্বন্ধে কয়েক জন আমেরিকান্ ও ইউরোপীয়ান লেখক যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহার সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিব। এতদ্ব্যতীত নিজে যাহা দেখিয়াছি, তাহারও উল্লেখ করিব।

সতীত্বের মূল্য—জাপান সম্বন্ধে যাঁহারাই পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহারাই এবিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। জাপানের স্ত্রী-চরিত্র এমনই বিচিত্র যে, কেহই তাহার আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অধিকাংশ গ্রন্থকারই বলেন যে, জাপানী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রকৃত সতী নাই, এবং এই জন্যই জাপানী ভাষায় সতীত্ব বোধক কোনও শব্দ নাই। ইংরাজীতে যাহাকে 'chastity' অর্থাৎ 'সতীত্ব' বলে, জাপানীরা তাহাকে 'তেইশো' (teiso) বলে। এই তেইশো শব্দের অর্থ,—স্ত্রীলোকদিগের গুণাবলী (womanly virtues)। অভিধানে 'মিসাও' (misao) ইত্যাকার আর একটি শব্দ দৃষ্ট হয়। উহার অর্থ,—fidelity of women। ঠিক সতীত্ব বুঝায়, এরূপ শব্দ জাপানী ভাষায় নাই বলিয়া যে, জাপ-রমণীগণের মধ্যে সতী নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। কারণ, জাপানীভাষাজ্ঞ সকলেই অবগত আছেন যে, উহা অদ্যাপি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ভাষার উন্নতিবিধানে জাপানীরা অতি অল্পদিন

যত্নবান্ হইয়াছেন। জাপানী ভাষার অধিকাংশ শব্দই চীন-ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে, এবং জাপানীরা আজও চীনভাষার অক্ষর ব্যবহার করিতেছেন। যে জাতির ভাষার এমন দোষ, তাহাদের অভিধানে যদি একটি কথার উল্লেখ না থাকে, তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তবে জাপ-সমাজে সতীত্বের যথাযোগ্য আদর আছে বলিয়া বোধ হয় না। বিবাহের সময় জাপানীরা ক'নের রূপেরই অধিক আদর করেন; চরিত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন না। রূপবতী হইলে চরিত্রহীনা নারীকেও সম্ভ্রান্ত-বংশীয় লোকেরা বিবাহ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হয় না। আমাদের দেশের 'বাইজী'দের ন্যায় জাপানে 'গেইসা' নামক এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে। তাহারা নৃত্য গীত করিবার সময় অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। এই কুহকে পড়িয়া অনেক ভদ্রলোক গেইসা বিবাহ করিয়া সতীত্বের মূল্য সমাজে কমাইয়া দিয়াছেন।

আবার ইহাও দেখা যায় যে, জাপ-সমাজে স্ত্রীলোকদিগের পুনর্ব্বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, অনেক যুবতী স্বেচ্ছায় বৈধব্যব্রত পালন করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই আদর্শ সতী। আমি এরূপ স্ত্রীলোক অনেক দেখিয়াছি।

সামাজিক অবস্থা—আর এক কথা এই যে, স্ত্রীলোকের চরিত্র আদর্শস্থানীয় না হইলে, নৈতিক জীবনে কখনই এত শীঘ্র জাপানীরা এরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন না। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে, প্রথমে সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হয়; নচেৎ কোনও জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এই সমাজ কেবল স্ত্রী কিংবা কেবল পুরুষ দ্বারা সংগঠিত হয় না। স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়ের সমবায়কে সমাজ বলে।

সংস্কার। জাপানী সমাজ পূর্ব্বে অতি বিশৃঙ্খল ছিল, এবং জাপানে স্ত্রীলোকের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। স্ত্রীশিক্ষাদির প্রচার করিয়া বর্ত্তমান সম্রাট্ স্ত্রীজাতির অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আধুনিক জাপ-রমণীগণ সকলেই স্বল্পবিস্তর শিক্ষিতা; এবং তাঁহারা তাঁহাদের পাশ্চাত্য ভগ্নীগণের সমস্ত অধিকারই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে জাপানীসমাজ পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে। তাই আজ জাপান পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বলিয়া রাখা ভাল যে, জাপানে স্ত্রীস্বাধীনতা থাকিলেও তথাকার রমণীগণ পুরুষের সমকক্ষ হইতে প্রয়াস পান না। ইহাঁরা এসিয়ার অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোকদিগের মত ছায়ার ন্যায় পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছেন। স্ত্রী-সুলভ লজ্জা ও কোমলতা ইঁহাদিগের চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী তাঁহারা একবার যদি জাপ-রমণীগণের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, স্বাধীনতা পাইলেই স্ত্রী-জাতি তাঁহাদের স্বভাবগত সদ্‌গুণসমূহ হারাইয়া ফেলেন না। পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীস্বাধীনতার ফল দেখিয়া, আমাদের আশঙ্কা হইবার অনেক কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু জাপ-রমণীগণ যেরূপ ধীর, শান্ত, অথচ স্বাধীনচেতা, তাহা দেখিলে আমাদের আর আশঙ্কা থাকিবে না। তবে শুধু স্বাধীনতা দিয়াই চুপ করিয়া থাকিলে চলিবেনা। উহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানও আবশ্যক।

সাধারণ গুণাবলী—জাপানী স্ত্রীলোকদিগের কতকগুলি চমৎকার গুণ আছে; তাহা আমাদের দেশের রমণীগণের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ইহাঁরা সর্ব্বদাই হাস্যময়ী, এবং প্রফুল্লহৃদয়া। ইঁহাদিগকে কচিৎ বিষণ্ণ-বদনা দেখা যায়। রোগ, শোক, দুঃখে ইঁহাদের স্বাভাবিক প্রসন্নতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। গীতবাদ্য ও নানাপ্রকার নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে ইঁহারা

সংসারকে সর্ব্বদা সুখময় করিয়া রাখেন। অনিত্য সংসারের সারমর্ম্ম ইঁহারাই বুঝিয়াছেন ; বুঝিয়াছেন বলিয়াই জীবিতাবস্থায় বৃথা শোক কিম্বা দুঃখে অভিভূত ও মৃতকল্প হইয়া থাকিতে সম্মত নহেন। যাহা ঘটিবার, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে, ইহাতে যখন মনুষ্যের কোনও হাত নাই, তখন বৃথা আক্ষেপ করা ইঁহারা অসঙ্গত মনে করেন। তাই প্রিয়তম পুত্র কিংবা স্বামীর বিয়োগেও জাপ-রমণীগণ অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন। এ সম্বন্ধে আমি একটি * প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিতেছি।

কোবে সহরে জাপান গভর্ণমেণ্টের একটি প্রকাণ্ড কর্পূরের কারখানা আছে। আমি সেখানে শিক্ষাকালে তথাকার একজন গৃহস্থের বাটীতে অবস্থান করি। গৃহস্থের নাম 'গোদা গিন্‌শবুরো'। [জাপানীরা পারিবারিক উপাধি পূর্ব্বে দিয়া পরে নাম লিখিয়া থাকেন :—সুতরাং যাহার নাম সুরেন্দ্র ঘোষ, তাহাকে ঘোষ সুরেন্দ্র বলা হয়]। ইঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইয়াছিল। সংসারে ইঁহার স্ত্রী, একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্র একুশ বৎসরে পদার্পণ করিলে দেশের বিধি অনুসারে যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার্থ তোকিয়োর মিলিটারী কলেজে গমন করেন। এদিকে বাটীতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তাঁহাদের কন্যার সহিত বাস করিতে থাকেন। প্রায় এক বৎসর কাল এইরূপে অতিবাহিত হইল একদিন বৃদ্ধ শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে স্বীয় মাদুরের কারখানা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ক্রমশঃ তাঁহার রোগ কঠিন হইয়া উঠিল। আত্মীয়, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ পুত্রকে সংবাদ দিতে বলিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ তাহার শিক্ষার অন্তরায় হইতে চাহিলেন না।

---

* যিনি মৎপ্রণীত 'জাপান-প্রবাস' পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন কন্যার মৃত্যুতে তাঁহার মাতা ও পিতা কিরূপ আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ধারণ করিয়া স্বহস্তে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

বৃদ্ধ যে ঘরে থাকিতেন, তাহার পার্শ্বেই আমার শয়নকক্ষ। উপরে উঠিবার জন্য সিঁড়ির ঘরটি দুই ঘরের লাগোয়া। বাড়ীটি দোতালা, কাষ্ঠনির্ম্মিত। সিঁড়িটিও কাঠের।

বৃদ্ধ আমাকে খুব স্নেহ করিতেন, এবং আমার শিল্পশিক্ষার একজন প্রধান সহায় ছিলেন। মৃত্যুর দিনও তিনি আমাকে শিল্পসংক্রান্ত কতকগুলি সারগর্ভ উপদেশ দেন। রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত আমি তাঁহার নিকটে ছিলাম, তৎপরে আমার কক্ষে আসিয়া শয়ন করি। অতঃপর বৃদ্ধের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে থাকে; এবং রাত্রি প্রায় তিনটার সময় তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। এই সময়ে বৃদ্ধা ও তাঁহার কন্যা নানা কার্য্যে অনেকবার নীচে ও উপরে যাতায়াত করিয়াছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের এই আসন্ন বিপদ সত্ত্বেও, তাঁহারা অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া উঠা নামা করিয়াছিলেন; ভয়, পাছে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। অধিক কি বলিব, আমার ঘুমের ব্যঘাত হইবে ভাবিয়া তাঁহারা নাকি উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কহেন নাই।

প্রভাতে উঠিয়া আমি যথারীতি আমার কার্য্যে বাহির হইলাম। বেলা প্রায় দশটার সময় বাসায় ফিরিয়া দেখি, সেখানে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখি, বৃদ্ধা তাঁহার এক জন নিকট আত্মীয়কে অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে আপ্যায়িত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আমি মনে করিলাম, না জানি কি এক বৃহৎ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইতেছে। কৌতুহলপরবশ হইয়া, বৃদ্ধাকে লোকসমাগমের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি স্বাভাবিকস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অনাতা গা শিরান্ কা? ওজিসান্ গা নাকুনারিমাশিতা।" অর্থাৎ "আপনি জানেন না কি? বৃদ্ধের শেষ হইয়াছে।" বৃদ্ধাকে স্বাভাবিক স্বরে এইরূপ বলিতে শুনিয়া আমি ভাবিলাম, পাড়ার

লাম, "দোকো নো ওজিসান্ দে গোজাইমাস্ কা ?" "অর্থাৎ কোথাকার বৃদ্ধ ?" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "উচি নো ওজিসান্ দেস্।" "অর্থাৎ এই বাটীর বৃদ্ধ।" আমি শুনিয়াই অবাক্। যাহা হউক, আত্মসংবরণ করিয়া উপরে চলিলাম। সিঁড়ির নিকট বৃদ্ধার * কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করিয়া আমি বলিলাম, "রাত্রিতে আমাকে উঠাইলে আমি আপনাদের কিছু সাহায্য করিতে পারিতাম,কিন্তু ডাকিলেন না কেন ?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আপনি বিদেশী, তাহাতে আবার আমাদের বাটীতে অতিথি-স্বরূপ আছেন, এ অবস্থায় আপনাকে বিরক্ত করা আমাদের অনুচিত। রাত্রিতে পাছে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে আমরা অতি সাবধানে চলা ফেরা করিয়াছি। আপনি আমাদের সাহায্য করিতেন শুনিয়া সুখী হই-লাম, এবং তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।" বৃদ্ধা ও তাঁহার কন্যা, উভয়েই যেরূপ স্বাভাবিক স্বরে আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার মনে কিরূপ ভাবের উদ্রেক হইল, পাঠকবর্গ সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

অনন্তর বৃদ্ধা ও তাঁহার কন্যা বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। এ সমস্ত আয়োজন করিবার সময়ে তাঁহাদের উভয়েরই মুখ প্রসন্ন। কাহারও যেন কিছুমাত্র দুঃখ হয় নাই। পিতা কিংবা পতির বিয়োগে আর কোন্ দেশের স্ত্রীলোকেরা এরূপ ধৈর্য্য ধরিতে পারেন জানি না! যে জাতির রমণীরা এরূপ সহিষ্ণুতার প্রতিমা, এ সংসার তাহা-দের নিকট সুখের আবাস, সন্দেহ নাই।

---

* মৃত্যু হইলে জাপানীরা যে সমস্ত অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন, তাহা মৎপ্রণীত

সংসারের কার্য্য সম্বন্ধে জাপ-রমণীগণ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী। অতি ধনবতী হইলেও ইঁহাদের সম্মুখে একটী তৃণেরও অপব্যবহার হইবার যো নাই। যে জিনিষের যেরূপ ব্যবহার করিলে, নিজেদের কিংবা স্বজাতির উপকার হইতে পারে, তাহা তাঁহারা সম্যক্ অবগত আছেন, এবং এই কারণেই সমগ্র জাপান পরিভ্রমণ করিলেও কাহারও বাটীতে কিংবা রাস্তায় একটী ভাত, এমন কি এক টুকুরা ছেঁড়া কাগজ পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। পাতের উচ্ছিষ্ট অন্ন, জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া পুনরায় ব্যবহৃত হয়। রাঁধিবার সময় যে ভাত পুড়িয়া যায় তাহা বাঁটিয়া চিনির সংযোগে সুন্দর মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। কাপড় কিংবা কাগজের টুকরাগুলি সযত্নে তুলিয়া রাখা হয়। কাগজ-প্রস্তুতকারিগণ উহা মূল্য দিয়া খরিদ করিয়া লইয়া যায়। এইরূপে কোনও জিনিষ জাপ-রমণীগণ নষ্ট হইতে দেন না।

ইঁহাদের রন্ধনপ্রণালী দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া জাপ-রমণীগণ রন্ধন আরম্ভ করেন। সকলেরই দুইটী করিয়া চুলা। একটীতে কয়লা ও অপরটিতে কাঠ ব্যবহৃত হয়। কয়লার উনানে তরকারী হয়, এবং ভাত সকলেই কাঠের উনানে রাঁধিয়া থাকেন। শুনিতে পাই, এবং আমারও বিশ্বাস, জগতে কেহই জাপ-রমণীদের ন্যায় সুমিষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিতে পারেন না। ভাতের মাড় না গালায়, এবং উহাতে প্রথম হইতেই ঠিক পরিমাণে জল দেওয়ায়, উহা যে সুমিষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর এক কথা এই যে, জাপানে সিদ্ধ ধানের চাউল আদৌ প্রচলিত নাই।

এই রন্ধনক্রিয়া ও স্ত্রীপুরুষ সকলের আহারাদিকার্য্য জাপ-রমণীগণ অনধিক দুই ঘণ্টার মধ্যে শেষ করিয়া ফেলেন। অতঃপর তাঁহারা গৃহসংস্কার, বস্ত্রাদি ধৌতকরণ ও শেলাই প্রভৃতি কাজে ব্যাপৃতা হন, এবং পুরুষগণ 'বেন্তো' (মাধ্যাহ্নিক ভোজন) লইয়া কর্ম্মস্থলে গমন করেন। পাঠকগণ ভাবিয়া

দেখুন, আহারাদি ও রন্ধন করিতে আমাদের কত সময় বৃথা অতিবাহিত হয়।

আধুনিক জাপ-রমণীগণ প্রায় সকলেই শিক্ষিতা। সরলমতি বালক-বালিকাদিগের প্রকৃত শিক্ষা ইঁহারাই দিয়া থাকেন। গল্পচ্ছলে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ—'সামুরাই' (যোদ্ধা) গণের জীবন-কাহিনীর বর্ণনা করিয়া, জাপানী মাতারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে স্বদেশপ্রেম ও প্রভুভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন।

সভ্যতায় এবং ভব্যতায় জাপ-রমণীগণের তুলনা নাই। অভ্যাগতকে ইঁহারা অতি সমাদরে আপ্যায়িত করেন। আগন্তুক অতি দরিদ্র হইলেও তাহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বড়লোকের স্ত্রী কিংবা কন্যা বলিয়া ইঁহারা কখনও অহঙ্কার করেন না; বস্তুতঃ, জাপ-রমণীগণ অহঙ্কার করিতে জানেন বলিয়াই বোধ হয় না। আমি জাপানে তিন বৎসরকাল অবস্থান করি; কিন্তু একদিনের জন্যও একটি অহঙ্কারী স্ত্রীলোক দেখি নাই। নিজেদের কোনও সদ্‌গুণ থাকিলে, তাহা অন্যকে বলা দূরে থাকুক, বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না।

নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা অনেক দেশেই পরস্পর বিবাদ কলহাদি করিয়া থাকে; কিন্তু জাপানে এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইয়াছে। জাপ-রমণীগণ কদাচ উচ্চকণ্ঠে কলহ, এমন কি, তর্ক বিতর্ক পর্যন্ত করেন না। তবে তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই পরোক্ষে নিন্দা করিতে দেখা যায়। ইহা তাহাদের পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল!

স্বদেশানুরাগ—দেশের প্রতি জাপ-রমণীগণের কিরূপ অনুরাগ তাহা নিম্নবর্ণিত ঘটনাবলী হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

বিগত রুস-জাপান যুদ্ধের সময় সামান্য পরিচারিকাগণ কিরূপ স্বদেশ

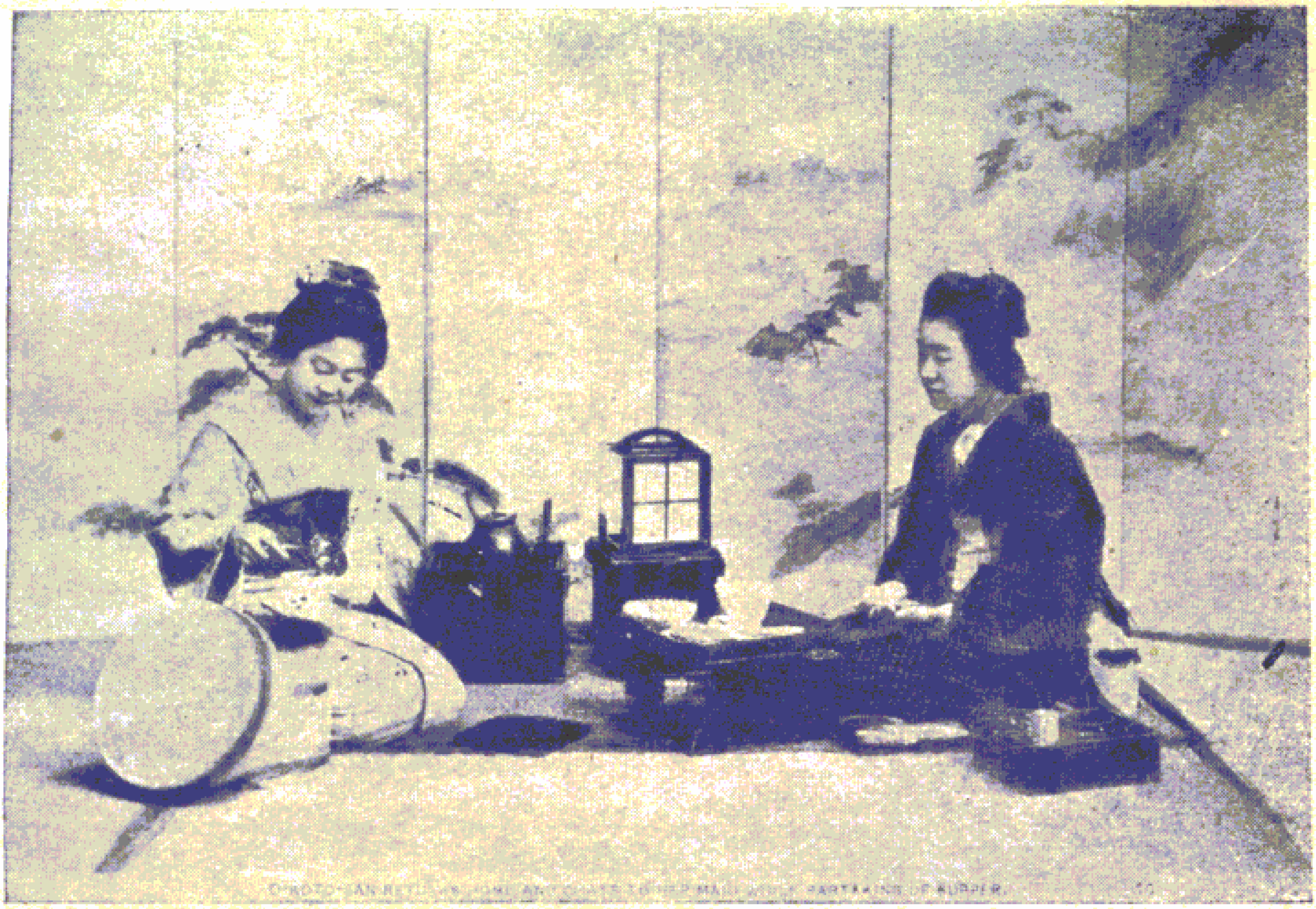

হিবাচীতে 'ওচা'র জল গরম হইতেছে ও একজন ভাত বাড়িতেছেন,
এবং অপরা স্বচীকার্য্যের সরঞ্জাম সম্মুখে উপনীতা।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

ভারতীয় ছাত্রাবাস গুলিতে যত জন পরিচারিকা ছিল তাহারা সকলেই পাতের উচ্ছিষ্ট অন্ন এবং রন্ধনকালে যে সকল ভাত পুড়িয়া যাইত তাহা জলে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ সাহায্যার্থে যুদ্ধ-কোষে (War-fund) পাঠাইয়া দিত। এমনও শুনা গিয়াছে যে অনেক সময়ে তাহারা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া কিছু কিছু অন্ন সঞ্চয় করিয়া, তাহা বুভুক্ষু এবং প্রপীড়িত সৈনিকপুরুষদিগের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছে।

আমি স্বচক্ষে একজন ধীবর কন্যাকে দেখিয়াছি। ইহার বয়ক্রম ১৮। বৎসর হইবে, ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত আমার জনৈক জাপানী বন্ধুর আলাপ থাকায় আমরা উভয়ে একদা উক্ত ধীবরালয়ে গমন করি। তথায় পৌঁছিবার ক্ষণকাল পর সেই ক্ষুদ্র গৃহস্থের সকলে একত্র সমবেত হইল। আমাকে (ইতিপুর্ব্বে আর কখনও বোধ হয় তাহারা ভারতবাসী দেখে নাই) দেখিবার জন্য ব্যগ্রতাই বোধ হয় ইহার কারণ! যাহা হউক আমি তাহাদের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ওদিকে সেই কন্যাটী আমাদের জন্য রন্ধন চড়াইয়া দিল। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে আহারের সময় কোনও জাপানীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে অতিথিকে সেই খানেই আহার করিতে হয়। জাপানে জাতিভেদ না থাকায় আমি সেই ধীবর কন্যার হস্তে প্রস্তুত সামুদ্রিক মৎস্যের ঝোল এবং অন্যান্য তরকারীর সহিত ভাত খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আহারের সময় কন্যাটির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঘোষ ছান্, আপনি কি জানেন যে বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধে আমার এই ভগ্নী স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরস্কৃতা হইয়াছেন?" আমি বলিলাম যে আমার বন্ধু 'মাছাদা' ছানের মুখে শুনিয়াছি বটে; কিন্তু সমস্ত ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর তিনি বলিতে লাগিলেন "রুশিয়ান্‌দিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে সৈনিক বিভাগের জনৈক উচ্চ পদস্থ রুশিয়ান কর্ম্মচারী ছদ্মবেশে জাপানে আসিয়া-

ছিলেন। তিনি 'সুমার' একটী সমুদ্রতীরবর্ত্তী হোটেলে বাস করিতেন। একদা তিনি আমার পিতাকে বলিলেন যে তিনি মৎস্য ধরিবার জন্য তাঁহার সহিত সমুদ্রে যাইতে ইচ্ছুক। পিতাঠাকুর তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। উক্ত কর্ম্মচারি যে সময়ে সেই প্রস্তাব করেন তখন আমার 'ইমোতো' (ছোট ভগ্নী) তথায় উপস্থিত ছিল। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া, রুষ কর্ম্মচারী প্রস্থান করিবার পর, পিতাঠাকুরকে বলিল যে বৈদেশিককে যেন সমুদ্রের গভীরতা সম্বন্ধে কোন সন্ধান লইতে দেওয়া না হয়। 'ওতোৎছান্' (পিতাঠাকুর) তাহার এই জ্ঞানপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বৈদেশিককে প্রত্যহ একই স্থানে মৎস্য ধরিতে লইয়া যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। রুষ-কর্ম্মচারী, পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত প্রত্যহ মাছ ধরিতে 'ওতোৎছানের' সহিত যাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ইহা হইতে বিরত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি জাপান হইতে রুশিয়া গমন করেন এবং কতিপয় সপ্তাহ পরই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অনন্তর উক্ত কর্ম্মচারীর 'ফটো' সংবাদ পত্রে বাহির হওয়ায় আমারা আমার 'ইমোতোর' দূরদর্শিতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম। এদিকে এই কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িলে তাহা গবর্ণমেণ্টের কাণে পৌঁছিল। সেই অবধি আমার 'ইমোতো' একজন প্রকৃত স্বদেশভক্ত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।"

এই বলিয়া তিনি আমাকে একটী রুশিয়ান্ 'রুবল' (সুবর্ণ মুদ্রা) দেখাইলেন। ধীবর ও তাহার কন্যাকে বশীভূত করিবার জন্যই নাকি ঐ মুদ্রাটী উক্ত কর্ম্মচারী তাহাদিগকে দিয়াছিলেন।

আর একটী স্বদেশানুরাগিনীর দৃষ্টান্ত দিয়াই প্রবন্ধটী শেষ করিব। এটীও রুষ-জাপান যুদ্ধের সময়কার। কোনও এক বৃদ্ধার একমাত্র যুবক সন্তানকে

যুদ্ধার্থে আহ্বান করা হইলে সে তাহার মাতার নিকট যাইয়া অতি করুণস্বরে বলিল, "মাতঃ, আমার যুদ্ধে যাইবার জন্য ডাক পড়িয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সে নিঃসহায় অবস্থায় আপনাকে রাখিয়া আমার যুদ্ধে যাইতে মন অগ্রসর হইতেছে না; এ অবস্থায় আমি কি করিব?" বৃদ্ধা কোনও উত্তর না দিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিলেন। ইত্যবসরে যুবক অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাটীতে আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে বৃদ্ধা একখানি পত্রে নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"বৎস, তোমার মাতৃভক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার মন অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া আমি মর্ম্মব্যথা পাইয়া আত্মহত্যা করিলাম। তুমি জগতে নগন্যা এক বৃদ্ধার জন্য তোমার এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের ও তোমার দেশস্থ সকলের অর্চ্চনীয়া জন্মভূমিকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছ! ধিক্, আমাদের বংশে! আর ধিক্ তোমার গর্ভধারিণীকে।"

পুরাকালে জাপ-রমণীগণ নিরক্ষরা হইলেও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাগণের ধর্ম্মবিশ্বাস অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহাও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল বলিয়া জাপানীরা নির্দ্দেশ করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাপ-রমণীগণের মধ্যে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে। আধুনিক স্কুল কলেজের মেয়েরা পুরুষোচিত অনেকগুলি ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া থাকেন। 'জিজুৎসু' ও টেনিস্ ইহাদের বড় আদরের জিনিস হইয়াছে। রাস্তায় বাহির হইলে, কত মেয়েকে পুস্তকাদি লইয়া বাইসিকেলে চড়িয়া স্কুলে যাইতে দেখা যায়। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে জাপ-সমাজ হইতে কতকগুলি দোষও প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে

জাপ-রমণীগণের প্রায় সকলেই ধূম ও 'সাকে' (দেশীয় মদ্য বিশেষ) পান করিতেন ; কিন্তু আজকাল খুব কম স্ত্রীলোককেই ধূম কিংবা সাকে পান করিতে দেখা যায়।

কৃষি এবং শিল্প।

ভারতবর্ষ, গ্রীস এবং রোম যখন উন্নত এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তখন সভ্যতা বলিলে যাহা বুঝাইত এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কালসহকারে মানব-সমাজে কি ঘোরতর বিপ্লবই সংঘটিত হইতেছে! পুরাকালীন সভ্যজাতির নিকট কৃষি এবং শিল্প সেরূপ সম্মানার্হ কাজের (honourable occupation) মধ্যে পরিগণিত না হইলেও ইহার যথাযোগ্য সমাদর জাপানে চিরকালই করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে দেশ উল্লিখিত বিষয়ে যতোধিক উৎকর্ষলাভ করিয়াছে সে দেশ ততোধিক সভ্য বলিয়া পরিগণিত। আর যে দেশ তাদৃশ উন্নতি করিতে পারে নাই তাহাকে অসভ্য পদবাচ্যে আখ্যাত হইতে হয়। যে জাপান এতদিন পর্য্যন্ত জগতে অসভ্য বলিয়া পরিচিত ছিল, সেও আজ সগর্ব্বে সভ্য সমাজে উপবিষ্ট। এশিয়ার পুরাতন সভ্য জাতিগণকে অর্থাৎ চীন ও ভারতবাসিগণকে এক্ষণে জাপানীরাও অসভ্য বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না!

জাপানীরা কৃষি এবং শিল্পে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। শিল্পের সহিত বাণিজ্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; সুতরাং তৎসম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বলিব। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জাপানীরা কিরূপে বর্ণভেদ ভুলিয়া গিয়া কার্য্য করিতেছেন এবং কিরূপ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত জাতীয় ধন বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গকে দেখাইতে ইচ্ছা করি। এতদ্ব্যতীত আধুনিক জাপানীদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কত বড় এবং জগতে একটি শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইবার জন্য ইঁহারা কিরূপ লালায়িত তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব।

জমির উর্ব্বরতা এবং কৃষকগণের যত্নের উপর কৃষিকার্যের সফলতা নির্ভর করে। জমির উর্ব্বরতা প্রয়োজনানুরূপ থাকিলেও কৃষকগণের যত্নের অভাব হইলে উহার ফল কিরূপ দাঁড়ায় ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বঙ্গদেশের ন্যায় উর্ব্বর প্রদেশ জগতে খুব কমই আছে ; কিন্তু হায় ! কৃষকগণের সে উৎসাহ এবং যত্ন কোথায় ? বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাবই যে আমাদের অবনতির কারণ তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিতে হইবেনা। শুধু কৃষক কেন অধিকাংশ শিক্ষিত ভূম্যধিকারীরও কৃষি সম্বন্ধে উপযুক্ত কোনও জ্ঞান না থাকায় ক্রমশঃ আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। যে দেশের উদ্বৃত্ত পণ্যশস্যাদি অন্য দেশে রপ্তানি হইয়া বহু অর্থ আনয়ন করিত আজ সেই দেশই দুর্ভিক্ষের প্রধান লীলাভূমি হইয়াছে, ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

জাপানী কৃষক—জাপান অতি ক্ষুদ্র দেশ ; ইহার আয়তন বঙ্গদেশ অপেক্ষাও ছোট। এতদ্ভিন্ন ইহার অধিকাংশ ভাগই পর্ব্বতময়। এক ষষ্ঠাংশ মাত্র চাষ করা হয়, তাহাও অনুর্ব্বরা। এমতাবস্থায় জাপানে যে শস্যাদি উৎপন্ন হয় তাহা কেবল কৃষকগণের পরিশ্রম এবং যত্নের ফল।* জাপানে যে কৃষকের পাঁচ ছয় বিঘা জমি আছে সে মহাসুখে দিন যাপন করে। প্রায়ই তাহারা সপরিবারে অতি স্ফূর্ত্তির সহিত সারাদিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রির প্রথমভাগ নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করে। জাতীয় উৎসব কিংবা অন্য কোনও ছুটীর দিনে তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় ভূষিত হইয়া প্রাকৃতিক শোভা উপভোগার্থে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে গমন করে। শত শত কার্য্য থাকিলেও ইহাদিগকে কখনও চিন্তান্বিত হইতে দেখা যায় না ; সহাস্য বদনে অতি স্ফূর্ত্তির সহিত সমুদয় কার্য্য একে একে করিয়া যায় ; দেখিলে বোধ হয় যেন

* জাপানের বাৎসরিক উৎপন্ন শস্যের মূল্য প্রায় সত্তর কোটী টাকা।

তাহাদের নিকট কোনও কার্য্যই কঠিন নহে। শিশুগণ ক্রীড়া করিবার সময় যেরূপ কৌতুহলতা প্রদর্শন করে, ইহারাও কার্য্যকালে সেইরূপ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপান অতি অনুর্ব্বরা দেশ। নানারূপ কৃত্রিম উপায়ে ইহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হয়। জাপানী কৃষকগণ কিরূপে সার সংগ্রহ করে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। জাপানে মেথরের ন্যায় কোনও পৃথক্ শ্রেণীর লোক নাই। কৃষকগণ নিজেরাই স্বহস্তে পায়খানাদি পরিষ্কার করে এবং উক্ত ময়লাদি স্কন্ধে করিয়া লইয়া নিজেদের জমিতে সার দেয়। পায়খানার জন্য গৃহস্থের কোনও অসুবিধা নাই; বরং অনেক গৃহস্থের সুবিধা আছে। কারণ কৃষকেরা আপনা হইতেই আসিয়া পায়খানা পরিষ্কার করে এবং মূল্যস্বরূপ গৃহস্থকে মাসিক কিছু কিছু দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রাস্তা ঘাটের প্রস্রাবটুকু পর্য্যন্ত বৃথা নষ্ট না হয় তজ্জন্য স্থানে স্থানে একটী করিয়া কাষ্ঠপাত্র রাখিয়া দেয়। এই প্রস্রাবও সারের কাজ করে। জাপানী কৃষকগণ তাহাদের জমির জন্য কিরূপ জঘন্য কার্য্য করে তাহা একবার পাঠকবর্গ চিন্তা করিয়া দেখুন; এবং পরে আপনাদের কৃষকগণের সহিত তুলনা করুন।

এই প্রসঙ্গে পাঠকবর্গের নিকট আমার একটি নিবেদন আছে। আপনারা যদি জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে এবং পল্লীর স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে প্রতি পল্লীতে দুই এক ঘর মেথর বসাইয়া ঘরে ঘরে পায়খানা নির্ম্মাণ করুন। ইহাতে সমাজের এবং দেশের কত উপকার হইবে তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ, জমিতে সার দেওয়া হইবে; দ্বিতীয়তঃ, পল্লীর মধ্যে কোনও দুর্গন্ধময় পদার্থ না থাকায় তথায় সর্ব্বদা নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হইয়া পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্য ভাল রাখিবে; তৃতীয়তঃ, সমাজের একশ্রেণীর লোকের (মেথরের) অন্ন সংস্থান হইবে এবং তাহা হইলে তাহারা অনেক দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইবে।

শুধু সার দিলেই জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় না। জলেরই বেশী আবশ্যক। যে সমস্ত জায়গায় নদী কিংবা নালা নাই, সেখানে জাপানী কৃষকগণ কূপ খনন করিয়া লয় এবং বৃষ্টির অভাব হইলে উহা হইতে জল সেচন করিয়া জমিতে দিয়া থাকে। সমস্ত ফসল, এমন কি, ধানের জমিতে পর্য্যন্ত এইরূপে জল দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশের কৃষকগণের ন্যায় বৃষ্টির অপেক্ষায় হাত পা জড় করিয়া, আকাশ পানে চাহিয়া করুণস্বরে 'হায় কি হ'লো' বলিয়া অরণ্যে রোদন করে না।

সার নির্ব্বাচন—অবশ্য জাপান গভর্ণমেণ্ট কৃষির উন্নতিকল্পে যথেষ্ট করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। জাপানের সর্ব্বত্র কৃত্রিম নালা কাটিয়া জলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অজ্ঞ কৃষকেরা যাহাতে সারের উপকারিতা বুঝিতে পারে তাহারও উপায় করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ফসলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সারের দরকার হয়। পায়খানার ময়লা এবং প্রস্রাব দুই একটী ফসলের জন্য উপযুক্ত হইলেও অন্যান্য জমির জন্য অন্যপ্রকার সারের প্রয়োজন হয়। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ কয়েকটী Experimental Farms খুলিয়া তথায় কিরূপ জমিতে কোন্ প্রকার সার দিলে ভাল হয় এবং উক্ত সার সমূহ কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ নানাপ্রকার সার দেশে প্রচলিত হইল। এই সময়ে নানাপ্রকার কৃত্রিম সার দেশে প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং অনেকগুলি প্রবঞ্চক কৃষকদিগকে খারাপ ভেজাল সার দিয়া অধিক মূল্য লইতে লাগিল। অনন্তর গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক সহরে এবং থানায় সার-পরীক্ষক (Inspector) নিযুক্ত করিলেন। এক্ষণে সার-প্রস্তুতকারকেরা সমস্ত সার গভর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করে এবং কৃষকগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া থাকে।

কৃষি বিদ্যালয়—কৃষকগণ এবং তাহাদের সন্তানদিগকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য জাপান গভর্ণমেণ্ট প্রতি জেলা এবং মহকুমায় পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত স্থানে কৃষি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় স্থূলভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্য Agricultural College আছে। এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা অনেক। ইহার শিক্ষকগণ (Professors) বিদেশে যাইয়া তত্রস্থ কৃষিপ্রথা প্রতি বৎসর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আবশ্যক মত নিজেদের দেশে প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। জেলা এবং মহকুমার কৃষিবিদ্যালয়গুলি ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং ইঁহারা সময়ে সময়ে তথায় যাইয়া সারগর্ভ বক্তৃতাদি করিয়া আসেন।

শিল্পানুষ্ঠান—এক্ষণে শিল্প এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। সকলেই অবগত আছেন আধুনিক জাপানীরা শিল্প এবং বাণিজ্যে পাশ্চাত্য কোনও সভ্যজাতি হইতে পশ্চাৎপদ নহেন; বরং অনেক স্থলেই তাঁহাদিগকে পরাভব করিয়াছেন। কি উপায়ে জাপানীরা এত শীঘ্র এই সমুদয় জটিল বিষয়ে সফলতা লাভ করিলেন তাহা অনেকে না জানিতে পারেন; সুতরাং সেই বিষয় একটু খুলিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ, জাপান গভর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে শিক্ষিত কারিকর (Experts) আনাইয়া শিল্পকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মূলধন সমস্তই গভর্ণমেণ্টের। এই বিদেশী কারিকরগণ মোটা মোটা বেতন পাইতেন বটে; কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন না। কারণ জাপানের উন্নতির সহিত তাঁহাদের কোনও স্বার্থ ছিল না, বরং অনেকেই উহার প্রকাশ্য শত্রু ছিলেন। তাঁহারা মন প্রাণ খুলিয়া কার্য্য করা দূরে থাকুক, যাহাতে জাপানের অভ্যুত্থানে তাঁহাদের স্ব স্ব জাতীয় শিল্পের কোনও ব্যাঘাত না জন্মে তদ্বিষয়েও বিশেষ সতর্ক ছিলেন। এই সমস্ত কারণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াও জাপান আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় নাই। ঠেকিয়া না শিখিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। শিক্ষিত বিদেশীয়দিগের হাতে সমস্ত কার্য্য সমর্পণ করিয়া

এবং প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াও যখন শিল্পের উন্নতি সাধিত হইল না তখন জাপানের চক্ষু ফুটিল। অনন্তর শিল্প শিক্ষার্থে গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া অনেকগুলি যুবক ইউরোপ এবং আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে পুরাকাল হইতে এই সময় পর্য্যন্ত জাপানে সামাজিক কঠোরতা নিবন্ধন কোনও ব্যক্তি পাশ্চাত্য দেশে যাইতে পারিতেন না এবং তত্রস্থ কাহাকেও তাঁহাদের দেশে আসিতে দিতেন না। যাঁহারা এই নিয়মের লঙ্ঘন করিতেন তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ প্রাণ হারাইতে হইত। বর্ত্তমান মেজিঅব্দের (Era of Reformation) প্রারম্ভেই জাপান গভর্ণমেণ্ট অনেকগুলি বন্দরে বিদেশীয় বণিকদিগকে ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেন। সেই অবধি ক্রমান্বয়ে বহু সংখ্যক বিদেশীয় লোক জাপানে আসিতে লাগিল। এ দিকে জাপানী যুবকগণও ঐ সময় হইতে দলে দলে ইউরোপে এবং আমেরিকায় যাইয়া শিল্পবাণিজ্য এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কারও আপনা আপনিই হইয়া আসিতে লাগিল। জাপানীরা পুরাকালীন বর্ণভেদ (Caste System) ভুলিয়া গিয়া দেশের উন্নতি কল্পে একযোগে কাজ করিয়া কিরূপ অসাধ্যসাধন করিতে লাগিলেন তাহা বর্ত্তমান জাপানের ইতিহাস পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয়।

আর একটী কথা এ স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশী শিক্ষিত কারি-করদিগকে দেশী শিল্পশালায় নিযুক্ত করিয়া এবং জাপ-যুবকদিগকে শিল্পশিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করিয়াই জাপান গভর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হন নাই। অনন্তর তোকিও, কোবে এবং ওসাকা সহরে অনেকগুলি শিল্প ও কলা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এখানকারও অধিকাংশ শিক্ষক বিদেশীয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন শিল্পাদি শিক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে বিদেশ হইতে শিক্ষা পাইয়া যাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেনতাঁহাদের কেহ উল্লিখিত বিদ্যা-

লয়ের শিক্ষক হইলেন, কেহ বা গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত কারখানাদিতে কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। জনসাধারণ শিল্প এবং বাণিজ্যের উপকারিতা সম্যক্ উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত এইরূপে গভর্ণমেণ্ট নানা প্রকার কারখানাদি খুলিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত কারখানায় লাভ হইতে দেখিয়া ক্রমশঃ জাপানীরা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একে একে সমস্তগুলির স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইলেন। অনেকে আবার নূতন নূতন কারখানা স্থাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপানের সর্ব্বত্র কারখানা স্থাপিত হইল। এক্ষণে একমাত্র 'ওসাকা' সহরেই বড় বড় যৌথ-কারবারের সংখ্যা অন্যূন পাঁচ সহস্র হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার তো অবধি নাই। ইতিমধ্যেই 'ওসাকা' সহরকে ইংলণ্ডের মানচেষ্টারের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। জাপানীরা যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছেন তাহাতে বোধ হয় আর বিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী হইয়া উঠিবেন। কোনও না কোন শিল্প কাজ না জানে, বা না করে এমন গৃহস্থ 'ওসাকা' সহরে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যাহারা নিজের মূলধন না খাটায় তাহারা অন্য কারখানার কাজ বাটীতে আনিয়া ফুরান চুক্তিতে করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ধনী লোকের মেয়েছেলেরা নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর উলের কাজ এবং কৃত্রিম পুষ্পাদি প্রস্তুত করিয়া বিস্তর উপায় করিয়া থাকেন। যাঁহারা বিক্রয়ার্থে কোনও জিনিষ প্রস্তুত করেন না, তাঁহারা নিজেদের ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি সেলাই প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। ফল কথা জাপানের কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক কেহই আলস্যের স্রোতে গা ঢালিয়া দেন না।

কৃষিই বলুন, শিল্পই বলুন, আর ব্যবসায়ই বলুন, লোক বিশেষের মূলধনে ইহার কোনটিই উন্নতির চরমসীমায় পৌঁছিতে পারে না। সমস্ত উন্নত জাতির ইতিহাসই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জাপানে শিল্পাদির উত্তরোত্তর প্রসার বৃদ্ধির সহিত যেমন মূলধনের আবশ্যক হইতে লাগিল তেমনি উহা সরবরাহ (supply) করিবার জন্য নানা স্থানে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল ; এই সমস্ত ব্যাঙ্ক কম সুদে টাকা ধার দিয়া নূতন কারবারের বিশেষ সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ জাপান অতি দরিদ্র দেশ হইলেও, মূলধনের অভাব সেখানে বড় হয় নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জাপানী যুবকগণ পাশ্চাত্য দেশ হইতে শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া প্রত্যাগত হইলে তাঁহাদিগকে গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত কারখানাদিতে নিযুক্ত করা হইতে লাগিল। এই সমস্ত যুবক ক্রমশঃ বিদেশী কারিকরদিগের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। প্রথমতঃ, তাহারা বিদেশী কারিকরগণের অধীনে থাকিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কাজ ভাল করিয়া শিক্ষা করিয়া লইতে লাগিল। পরে যখন তাঁহাদের নিকট হইতে শিখিবার আর কিছু থাকিত না তখন একে একে তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিয়া উপযুক্ত দেশী যুবকদিগের দ্বারা কাজ চালান হইতে লাগিল। এইরূপ শুধু শিল্পে নহে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে,বাণিজ্য ব্যাপারে,রেলওয়ে, জাহাজে,এমন কি সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত বিদেশীয়গণকে শীঘ্রই জাপানীদের নিকট 'হার' মানিয়া ক্রমশঃ দেশে ফিরিতে হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাপানে সহস্র সহস্র বিদেশীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন ; কিন্তু আজ কাল তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। কোনও কোনও কাজে বিদেশীয় লোকের দরকার হইলেও আজকাল আর তাঁহাদিগকে সর্ব্বেসর্ব্বা হইবার যো নাই। সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইয়া কাজ করিতে হয়। একজন দুই শত টাকা বেতনের জাপানী ডিরেক্টর বা ম্যানেজারের অধীনে দুই তিন জন হাজার বা বার শত টাকা বেতনভোগী বিদেশীয়কেও কাজ করিতে দেখা যায়। জাপানীরা এইরূপে আত্মসম্মান এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহারা যে পাশ্চাত্য

জাতিগণের তুলনায় কোনও অংশে হীন নহেন তাহার প্রমাণও এতদ্বারা সর্ব্বসমক্ষে দিতেছেন।

দেশীয় শিল্পের সাহায্যার্থে জাপান গভর্ণমেণ্ট আর একটী কাজ করিয়াছেন। বিদেশ হইতে আমদানী জিনিসের উপর অতি গুরুতর শুল্ক ধার্য্য করিলেও যে সমস্ত জিনিস আজও পর্য্যন্ত জাপানে প্রস্তুত হয় না, বা হইতে পারে না, অথবা যে সমস্ত কাঁচা মাল (Raw materials) জাপানের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয়, তাহার শুল্ক দিতে হয় না। আবার জাপানে প্রস্তুত জিনিস বিদেশে রপ্তানি করিতে হইলেও শুল্ক (Custom duty) দিতে হয় না।

এইরূপ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া জাপানের শিল্প দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সমস্ত বিষয়ে জাপানীদেরও এক অদ্ভুত শক্তি পরিস্ফুটিত হইতে লাগিল। ইঁহাদের উদ্ভাবনাশক্তি সেরূপ প্রখর না হইলেও অনুকরণ করিবার ক্ষমতা অতি আশ্চর্য্যজনক। ইউরোপ এবং আমেরিকায় ব্যবহৃত প্রকাণ্ড কল কারখানা অতি সংক্ষেপে জাপানের প্রয়োজনানুসারে প্রবর্ত্তিত করিয়া জাপানীরা কি অসাধারণ শক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন! যে কলের মূল্য ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় দুই তিন সহস্র টাকা হইবে, জাপানীরা তাহা অতি সংক্ষেপে প্রস্তুত করিয়া ২০০৲।৩০০৲ শত টাকায় বিক্রয় করিতেছেন। এই জাতীয় কলের আসল অংশটুকু লৌহ কিংবা ষ্টীল নির্ম্মিত; কিন্তু বাকি সবই কাঠ।

ব্যবসায়—উল্লিখিতরূপে শিল্পের উন্নতি সাধন হইলে জাপানীরা ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। স্বদেশজাত জিনিস সর্ব্বত্র প্রচারার্থে জাপানের বড় বড় সহরে যাদুঘর স্থাপিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত যাদুঘরে (museum) বিদেশজাত জিনিসের পাশাপাশি নিজেদের জিনিস, তাহার উৎপত্তিস্থান ও মূল্য লিখিয়া রাখা হইল। শিল্পীগণ এই দুই জিনিসের তুলনা

করিয়া নিজেদের প্রস্তুত জিনিসের দোষ গুণ বিচার করিয়া যথা কর্ত্তব্য করিতে লাগিলেন। অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত কারিকরগণের সাহায্যার্থে এই সমস্ত যাদুঘরের সহিত Chemical Analysist এবং Laboratory আছে। ফি দিলে যিনি যে জিনিসের প্রস্তুত প্রাণালী জানিতে চাহেন জানিতে পারেন। জাপানের এই Museum গুলি কিরূপে পরিচালিত হয় তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক; কারণ বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশেও ঐরূপ Museumএর অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

জাপানের Museum গুলির ব্যয় সঙ্কুলানার্থে কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ীদের ন্যায় চলিতেছেন। যিনি যাঁহার জিনিস প্রদর্শনার্থে এখানে রাখিতে চাহেন তাঁহাকে খাজানা বা ভাড়া স্বরূপ এক একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত দেশ এবং বিদেশ হইতে ব্যবসায় বাণিজ্যেরও সংবাদ আনাইয়া দিবার জন্য স্বতন্ত্র ফি লওয়া হয়। এইরূপে এক একটী Musuem একাধারে প্রদর্শনী Bureau of Information এবং Experimental Laboratoryর কাজ করে। বড় বড় museum এর সহিত আবার শিল্পাদি সংক্রান্ত সংবাদপত্রাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য কৃষিজাত জিনিসও এই সকল museumএ রক্ষিত হইয়া থাকে।

কৃষি এবং শিল্পপ্রদর্শনী জাপানেও হইয়া থাকে; কিন্তু museumএর প্রতিই জাপানীদের বেশী অনুরাগ। দর্শকবৃন্দের মনে একটা স্থায়ী impression করিতে museumএরই দরকার। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদের দেশীয় নেতৃবৃন্দ অথবা ব্যবসায়ীগণ এদেশের সর্ব্বত্র ঐরূপ museum স্থাপিত করিতে উদ্যোগী হইবেন কি? সহস্র প্রদর্শনী অপেক্ষা একটী স্থায়ী museum এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনীয়।

স্বাস্থ্য এবং গভর্ণমেণ্ট।

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে জাপানী স্ত্রী এবং পুরুষ সকলই বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ। ইহার কারণ যথাক্রমে নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। আশা করি আমাদের দেশবাসিগণও ঐ সমস্ত নিয়ম সাধ্যানুসারে প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিবেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা—প্রথমতঃ, জাপানীরা শোক কিংবা দুঃখে কিঞ্চিন্মাত্র অভিভূত বা বিচলিত হন না। ইঁহাদের মুখে সর্ব্বদাই হাসি বিরাজ করিতেছে, ইঁহাদের প্রফুল্ল আনন দেখিলে ইঁহাদিগকে প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়। মানব জাতির কথা দূরে থাকুক, পাঠকবর্গ, আপনারা কেহ এমন কোনও জীব দেখিয়াছেন, যাহারা শোকে কাতর না হয়? মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াও জাপানীরা স্বর্গ সুখ অনুভব করিতেছেন; কারণ শোক ইঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রাণাধিক পুত্র কিংবা পৌত্রের মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র অশ্রুপাত না করিয়া যাঁহারা অবিচলিত চিত্তে সংসারকার্য্য করিতে পারেন তাঁহাদের ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও ঐশ্বরিক শক্তি নিহিত আছে; নচেৎ এরূপ হওয়াও কি সম্ভব? শরীরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে মনের সহিত স্বাস্থ্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাই চিত্তের অবিচ্ছিন্ন প্রসন্নতাকেই তাঁহারা দীর্ঘজীবি হইবার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাপানী-জীবন এই বাক্যটির যাথার্থ্যতার প্রমাণ দিতেছে। এশিয়াবাসীদের মধ্যে জাপানীরাই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী।

জাপানী নরনারিগণের শারীরিক সুস্থতা এবং সবলতার দ্বিতীয় কারণ এই যে আজন্মকাল ইঁহারা কখনও কাঁচা জল পান কিংবা উহাতে স্নান করেন

না। ভুমিষ্ট হইবামাত্রই নবজাত শিশুটীকে অতি গরম জল দ্বারা স্নান করান হয়। তৎপরে যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ততদিন তাহাকে গরম জল পান এবং উহাতে স্নান করিতে হয়। খাদ্যদ্রব্য সমুহও গরম গরম খাইবার ব্যবস্থা। এই সমস্ত কারণে জল কিংবা খাদ্য দ্রব্যের সহিত কোনও রূপ অস্বাস্থ্যকর পদার্থ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। পানীয় জলের সহিত যে সমস্ত কীটাণু প্রাণিগণের শরীরে প্রবেশ করে, তাহাই তাহাদের স্বাস্থ্য হানির এমন কি অধিকাংশ স্থলে মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ন্যায় জগতের অন্য কোনও দেশে নানা প্রকার সংক্রামক ব্যারাম (Epidemics) নাই। আমরা যে জলে স্নান করি, তাহাতেই কাপড় ধুই এবং তাহাই আবার পান করিয়া থাকি। ইহাতে আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না। এই যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ্ ইত্যাদি ব্যারামের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তাহার কারণ কি? এই সমস্ত সংক্রামক ব্যাধির করাল গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার উপায় আমাদেরই হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। যদি আমরাও জাপানীদের ন্যায় গরম জল পান এবং উহাতে স্নান করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেশের স্বাস্থ্য ভাল হইবে। দেশের স্বাস্থ্য ভাল হইলেই আমাদের শারীরিক এবং মানসিক বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নৈতিক উন্নতিও সাধিত হইবে। যতদিন ভারতভূমি করাল মূর্ত্তি ব্যাধি সমূহের আবাস ভূমি থাকিবে, ততদিন আমাদের সর্ব্বদিকেই অবনতি হইবে। এ অবস্থায় উন্নতি হওয়া অসম্ভব! তাই বলিতেছি যাঁহারা জন্মভূমির দুঃখ মোচনে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রথমে এই বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখেন। গরম জল ব্যবহার-প্রচলন করা কঠিন ব্যাপার নহে, গরম জলের বিরুদ্ধে কয়েকটী আপত্তি স্বভাবতঃ ভারতবাসিগণের মনে উঠিতে পারে; কিন্তু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে দেখা

যায় সে সমস্ত কাল্পনিক মাত্র। বিষ তুল্য কীটানু সমুহ পানীয় জলের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করাতে আমরা সর্ব্বদাই অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় কালযাপন করিতেছি। ভারতীয় যুবকবৃন্দের শরীরে সে বল নাই, হৃদয়ে সে শক্তি নাই এবং স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতিও সেরূপ অনুরাগ নাই। বাল্যাবস্থা হইতে নানাবিধ সংক্রামক পীড়াক্রান্ত হওয়ায় তাহারা এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াছে, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন আমাদের অসাবধানতা হেতু অসংখ্য প্রিয়জন অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে, ইহাও কি কম আক্ষেপের বিষয়! যে গুলির প্রতীকার আমাদের হস্তে রহিয়াছে তাহা আমরা করি না কেন? কেহ কেহ বলিবেন, গরম জলের ব্যবস্থা করা ব্যয় সাপেক্ষ; একথা সত্য, কিন্তু আমরা রোগের চিকিৎসার জন্য যে অর্থ প্রতি বৎসর ব্যয় করিয়া থাকি, তাহার এক শতাংশ ব্যয় করিলে গরম জলের সুব্যবস্থা করা চলে; অধিকন্তু পীড়ার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সকলে মহাসুখে ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে কাল যাপন করিতে পারি। পরিবারস্থ একটা শিশুর অসুখ হইলে অর্থ ব্যয় করিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; তাহার সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত মাতা পিতাকে কিরূপ দুর্ভাবনায় এবং অশান্তিতে বাস করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

গরম জল সম্বন্ধে আর একটী আপত্তি হইতে পারে। সেটী এই— অনেকে বলিবেন যে গরম জল অপেক্ষা কাঁচা জল সুস্বাদু এবং মিষ্ট। জাপানে যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমারও ঐরূপ ধারণা ছিল, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে, জল খুব ফুটাইয়া গরম করিলে উহা পান করিতে বেশ সুস্বাদু হয়। প্রথম কয়েক দিন গরম জল ভাল লাগে না; কিন্তু একটু অভ্যস্ত হইলেই উহা বেশ মুখপ্রিয় হয়, তবে জল গরম গরম পান করিতে হয়। যাঁহারা আমার এই উক্তি সমর্থন না করেন তাঁহারা যেন একবার পরীক্ষা

করিয়া দেখেন। এবং কাঁচা জল অপেক্ষা ভাল বিশ্বাস হইলে যেন উহা আর কদাচ পরিত্যাগ না করেন।

জাপানীরা অত্যন্ত গরম জলে স্নান করেন বলিয়া ইঁহাদের গায়ে খোস্ কিংবা পাঁচড়া হয় না। প্রত্যহ 'ফুরো' অর্থাৎ স্নানাগারে যাইয়া ইঁহারা গরম জল দ্বারা এরূপভাবে সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া থাকেন যে শরীরে কোথাও একটু মাত্র ময়লা থাকিতে পারে না। এইরূপ লোমকূপ সমূহ পরিষ্কার থাকায় ইঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। গ্রীষ্মকালেও ইঁহারা কাঁচা ঠাণ্ডা জলে স্নান করেন না। কেহ কেহ কাঁচা জল দিয়া মস্তক পর্য্যন্ত ধৌত করেন না।

জাপানে নদীর জলে নামিয়া স্নান করিবার অধিকার কাহারও নাই। নদীতে নামিয়া স্নান করিলে উহার জল অপরিষ্কার হয়, এবং সেই অপরিষ্কার জল পান করিলে নানা প্রকার ব্যারাম হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে নদীতে নামিয়া স্নান করা রাজবিধান দ্বারা নিষিদ্ধ। গভর্ণমেণ্টের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যদি কেহ নদীতে স্নান করে বা উহার জলে কাপড় কাচে তাহা হইলে প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করে। নদীর জল স্বভাবতঃ পরিষ্কার হইলেও জাপানীরা উহা গরম না করিয়া পান করেন না। প্রতি জাপানী গৃহেই সর্ব্বদা গরম জল পাওয়া যায়। জল পূর্ণ (kettle) কেট্‌লি দিবা রাত্রি আগুণের উপর রক্ষিত হইয়া থাকে। জাপানীরা কি জানেন না যে সর্ব্বদা গরম জল করিতে হইলে পয়সা লাগে? যে জাতি একটী পয়সা নিরর্থক ব্যয় করে না তাহারা গরম জলের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে ইহার কোন গূঢ় অর্থ আছে।

জাপানে নদীর সংখ্যা খুবই কম; সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই কূয়ার জল গরম করিয়া পান করা হইয়া থাকে। যে সমস্ত সহরের কিংবা উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে জল প্রবাহ আছে তথায় উহার জল কলে পরিষ্কার করিয়া পরে গরম

বস্ত্রধৌতকরণ।

Emerald Ptg. Works, Calcutta

করিয়া পান করা হয়। কোবে, আরিমা প্রভৃতি স্থানের লোকেরা জল প্রপাতের জল পান করিয়া থাকেন। জল প্রপাতের জলে ধাতব পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকায় উহা বেশ স্বাস্থ্যকর।

ব্যায়াম—জাপানী মাত্রেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ পূর্ণতা লাভ করে; ইহার কারণ এই যে বাল্যকাল হইতে বালকবালিকাগণ নানা প্রকার স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকর ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া থাকে। পাঠশালায় বালকগণকে যে সমস্ত ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়, বালিকাগণকেও সে সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত একটু বড় হইলে বালকগণ সমুদ্রে গিয়া নৌকা চালন এবং সন্তরণ শিক্ষা করে। যে সকল স্থানের নিকটে সমুদ্র নাই তথাকার নদীতেই সন্তরণ শিক্ষা করিয়া থাকে। ছাত্রগণের শারিরীক এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই প্রস্তুত। জন সাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতিও গভর্ণমেণ্টের সম্যক্ দৃষ্টি আছে, এবং এজন্যই জাপানীরা সুস্থ শরীরে এবং স্বচ্ছন্দ চিত্তে বাস করিতে সমর্থ হইতেছেন। আমরা ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ করিতে পারি কি?

অন্যান্য দেশের শিশুগণ যে বয়সে শুধু পায়ে হাঁটিতে শিখেনা, জাপানী শিশুগণ সেই সময় হইতে 'গেতা' পায় দিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে শিশুগণের দুরবস্থা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 'গেতা' শব্দের অর্থ কাষ্ঠ পাদুকা বিশেষ, উহার গোড়ালি (Heels) অত্যন্ত উচু হওয়ায় শিশুগণ উহা পায়ে দিয়া একপা অগ্রসর হইতে না হইতেই ২।৩ বার আছাড় খাইয়া পড়ে। হাঁটিতে হাঁটিতে শিশুগুলি পড়িয়া গেলে কেহ তাহাদিগকে উঠাইয়া দেয় না, কিংবা তাহাদের শরীরে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করে না। পড়িয়া যাইবার পর শিশুগণ এদিক ওদিক চাহিয়া দুই এক বার ক্রন্দন করে, যখন দেখে কেহই তাহাদের সাহায্যার্থে আসিল না, তখন অগত্যা চুপ করিয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া উঠিতে চেষ্টা করে। আশ্চর্য্যের

বিষয় এই যে শিশুদের মাতা কিংবা সহচরেরা কেহই তাহাদের এই বিপদের সময় সাহায্য করে না। আমি স্বয়ং ৩।৪টী শিশুকে পতিতাবস্থা হইতে হাত ধরিয়া উঠাইয়াছি। শৈশবাবস্থায় এইরূপভাবে আঘাত পাওয়ায় উহাদের কোমল শরীর ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে। তৎপরে ভাল করিয়া হাঁটিতে শিখিলেও সর্ব্বদা 'গেতা' পায়ে দেওয়াতে পায়ের পেশীগুলি (muscles are well developed) বেশ পূর্ণতা লাভ করে। জাপানী স্ত্রী পুরুষ সকলেই 'গেতা' ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং এই কারণেই তাহাদের সকলেরই পায়ে খুব শক্তি আছে।

অন্যান্য স্বাস্থ্যকর ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে জাপানী যুবকেরা 'জিজুৎসু' অর্থাৎ কুস্তি শিখিয়া থাকে। জাপানী জিজুৎসু জগতে বিখ্যাত; অস্ত্রশস্ত্র বিনা আত্মরক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে জিজুৎসু অতি প্রকৃষ্ট উপায়। ইহাতে ব্যায়ামকারীর শরীরের সমস্ত পেশী যথাযোগ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং শরীরের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। শারীরিক বল বৃদ্ধি করিবার জন্য জাপানী যুবকেরা অনেক পাশ্চাত্য ব্যায়ামও করিয়া থাকে। ফুটবল, ব্যাটবল, টেনিস, বেসবল ইত্যাদি জাপানী যুবকগণের অতি আদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শাসন-পদ্ধতি।

প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটী দ্বীপপুঞ্জ লইয়া জাপান-সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে। এই দ্বীপগুলি সমস্তই পর্ব্বতময়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইলেও এখনও পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক একান্নটী বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে অনেকগুলিই আজও পর্য্যন্ত অগ্নি উদ্গীরণ করায় জাপানে প্রতিবৎসর দুই তিন শতবার অল্প বিস্তর ভূমিকম্প হইয়া থাকে। পুরাকালে জাপান যখন অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত তখন তাহার শাসনপদ্ধতি কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। তৎকালীন রাজ পুরুষগণের যদিও সাম্রাজ্য বৃদ্ধির প্রতি সেরূপ দৃষ্টি ছিল না, তথাপি জাপানকে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কোনও জাপানীর বিদেশে গমন কিংবা কোনও বিদেশীয়ের জাপানে আগমন, সমাজ এবং রাজবিধান দ্বারা নিষিদ্ধ থাকায় সে সময়ে জাপানীরা বহির্জ্জগতের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিতেন না। যে সমস্ত* জাপানী যুবক শিক্ষা কিংবা বাণিজ্যার্থে বিদেশে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে গমন করিতেন, এবং যে সকল খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ শত শত বাধা সত্ত্বেও ধর্ম্ম প্রচারার্থে জাপানে যাইতেন, তাঁহারা যে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে

---

* বর্ত্তমান জাপানের নির্ম্মাতা প্রিন্স ইতো পাশ্চাত্য দেশ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া স্বদেশ-প্রত্যাগত হইলে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য দুই তিন বার চেষ্টা করা হয়। সৌভাগ্যের বিষয় আততায়ীদিগের এই চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।

কত জনই যে অবিচারে প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহা স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহ জানেন না। এটী আমার আলোচ্য বিষয় নহে, সুতরাং অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

মিকাদো—বর্ত্তমান 'মিকাদো' (Emperor) সিংহাসনে আরূঢ় হইলে 'মেজি' (Enlightened Era of Reformation) অব্দ আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে জাপানের শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। এক্ষণে উহা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য 'ছাঁচে ঢালা' হইয়াছে।

জাপানের শাসনপদ্ধতি রাজতন্ত্র হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা প্রজাতন্ত্রের রূপান্তর মাত্র; কারণ উহাতে প্রজাবর্গের অভিলষিত সমস্ত অধিকারই আছে। প্রজাসাধারণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া প্রতিনিধিগণ রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া রাজকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচারী হইয়া কিছুই করিতে পারেন না। ফল কথা এই যে, জাপানের রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তির মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। প্রজাবর্গের হিতসাধনার্থে এবং সম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে উভয়দল একমত হইয়া কার্য্য করায় জাপানীদের নিকট সমস্ত কার্য্যই সহজসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্রাট্ প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনার্থে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকায় প্রজাবর্গও তাঁহার নিতান্ত অনুগত। এবং সেই কারণেই সম্রাট্ কিংবা সাম্রাজ্যের কোনও বিপদে তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পাত করিতেও কিঞ্চিৎ মাত্র কুণ্ঠিত নহেন। বিগত চীন-জাপান এবং রুষ-জাপান যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সম্রাটের প্রতি অটল ভক্তি এবং স্বদেশের প্রতি অনুপম প্রেম প্রদর্শন করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে এখানে রাজা এবং প্রজার সম্বন্ধ পিতা এবং পুত্রের ন্যায়। হিন্দুর আদর্শ রাজা রামচন্দ্র সত্যযুগে যেরূপ পূজিত হইয়াছিলেন, জাপানের বর্ত্তমান সম্রাট্ এই কলিযুগে সেইরূপ পূজিত

এবং সম্মানিত হইতেছেন। প্রজাগণের হস্তে তাঁহার প্রাণের কোনও আশঙ্কা নাই, এই ধ্রুব বিশ্বাসটি জাপ-সম্রাটের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকায় তিনি আত্ম-রক্ষার্থে উপযুক্ত প্রহরী (Bodyguard) পর্য্যন্ত রাখেন না। আমি অনেবার তাঁহাকে জনতাপূর্ণ রাস্তায় বাহির হইতে এবং ট্রেণে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু একবারও তাঁহার সহিত দুই জনের অধিক প্রহরী দেখি নাই প্রহরী ব্যতীতও তাঁহাকে বাহির হইতে দেখিয়াছি। সকল দেশেই দেখিতে পাই, সম্রাট্‌গণ, এমন কি তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ পর্য্যন্ত, প্রজাদের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। কিন্তু জাপ্-সম্রাট কি ভাগ্যবান্ পুরুষ! প্রজাবর্গের উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস থাকিবার আর একটি বিশেষ কারণ এই যে পুরাকাল হইতে আজও পর্য্যন্ত একজন সম্রাটও প্রজা কর্ত্তৃক নিহত হন নাই। জাপানের পক্ষে এটি কম গৌরবের কথা নহে।

সাম্রাজ্য বৃদ্ধি—ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে বিগত চীন-জাপান যুদ্ধের পর হইতে জাপান সাম্রাজ্যের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বিগত চীনজাপান এবং রুষ-জাপান যুদ্ধের ফলে 'ফরমোসা' দ্বীপটী (জাপানীরা যাহাকে 'তাইবাং' বলেন) এবং মাঞ্চুরিয়ার খানিক অংশ জাপান-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কোরিয়াধিপতি নাকি রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় জাপান-গভর্ণমেণ্টকে উহা রক্ষা করিতে অনুরোধ করেন এবং এই কারণেই কোরিয়ার শাসন ভার জাপানের হস্তে পড়িয়াছে। এই গেল জাপানী জনসাধারণের মধ্যে এক দলের অনুমান। আর একদলের মতে কোরিয়ান্‌গণ অশিক্ষিত এবং আলস্যপরবশ হওয়ায় জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া উহার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এই দ্বিতীয় অনুমানটীই সত্য; নচেৎ কোরিয়াধিপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যুবরাজকে তথায় বসাইবার কারণ কি? এই যুবরাজ (বর্ত্তমান রাজা) আজ কাল জাপান-গভর্ণমেণ্ট হইতে 'মাসহারা' লইয়া জাপানে শিক্ষা লাভ করিতেছেন এবং কোরিয়ার শাসন-

দণ্ড * প্রিন্স 'ইতো' (জাপানের প্রকৃত নির্ম্মাতা) আরও কয়েকজন জাপানী উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের সাহায্যে চালাইতেছেন। অনন্তর কোরিয়ান্‌গণ শাসন-কার্য্যে প্রতিবন্ধক হওয়ায় তাঁহাদিগকে একে একে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করান হইতেছে। শুনিতে পাই কোরিয়ান্‌গণ আত্ম-নির্ভরশীল হইলে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। জাপানের যদি এই অভিপ্রায় বাস্তবিকই হয়, তাহা হইলে উহা কি সাধু!

জাপান-সাম্রাজ্য আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার অধিবাসিগণ আকারে খর্ব্বা-কায় হইলেও এবং তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম হইলেও, প্রত্যেক জাপানীর ভিতরে যে তেজঃপুঞ্জ নিহিত রহিয়াছে তাহার পূর্ণবিকাশ হইতে না হইতেই সমগ্র জগৎ চমকিত হইয়াছে। জানি না, জাপ-হৃদয়ে 'বুসিদো'র (Spirit of the Knights) পূর্ণ বিকাশে জড় জগতে কি পরিবর্ত্তনই ঘটিবে! সূর্য্যোদয়ে কুমুদিনীকে যেরূপ ম্রীয়মানা হইতে দেখা যায়, জাপ-শক্তির জাগরণে পার্শ্ববর্ত্তী শক্তি-পুঞ্জেরও (Neighbouring Powers) মনে ভীতির সঞ্চার হওয়ায়, তদবস্থাপন্ন হইতে হইয়াছে। জাপানের নিকটবর্ত্তী দ্বীপ-সমূহের অধিকারীগণ জাপ-তেজে অৰ্দ্ধদগ্ধ হইয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইউরোপ এবং আমেরিকার সংবাদপত্র সমূহ পূর্ব্ব হইতেই স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিতেছেন এবং তাঁহারা জাপানকে Yellow Peril বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছেন।

YELLOW PERIL—পাঠকবর্গ, মনে করিবেন না যে বৃহৎ বৃক্ষের ছায়াতলে বসিয়া আছেন বলিয়া আপনাদের কোনও বিপদ নাই। অতি সত্বরই আপনাদিগকেও জাপনীদের বিশ্বব্যাপী 'জালে' পড়িয়া 'হাবুডুবু' খাইতে হইবে।

---

* কোরিয়ার শাসনভার হস্তে লইবার পর প্রিন্স ইতো একদল বিদ্রোহী কোরিয়ান্‌ কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন।

জাপানের রাজশক্তি আপনাদিগকে আপাততঃ স্পর্শ করিতে নাও পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। রাজশক্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রবলা * শক্তি আপনাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত। এই শক্তির ফল আজ আপনারা প্রায় ২০০ বৎসর ভোগ করিয়া আলস্যের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, নচেৎ আজ পরিধানের বস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার বাতি দিবার দিয়াশলাই পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে কেন আনাইতেছেন? আপনাদেরও বিদেশীয় অন্যান্য জনসাধারণের ন্যায় হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ এবং বুদ্ধি কৌশল আছে, তবে কেন নিরাশ্রয় অন্ধের ন্যায় তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছেন? দিন দিন আপনাদের কি দশা হইতেছে তৎপ্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়া নিজ পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখুন। নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন এবং যাহা নিজেরা তৈয়ারী করিতে অক্ষম, তাহা বিদেশ হইতে কারিকর আনাইয়া কিম্বা বিদেশ হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়া দেশে প্রস্তুত করুন। নচেৎ এই প্রতিযোগীতার কঠোর যুগে জীবন ধারণের আর কোনও উপায় নাই।

এস্থলে 'স্বদেশী' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি, আশা করি পাঠকবর্গ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। প্রায় দশ বৎসর হইল আমরা 'স্বদেশী' মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। জাপানীরা শিল্প-বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যবৃদ্ধির জন্য যেরূপ আকুল, আমাদিগকেও স্বদেশী বিস্তারের নিমিত্ত তদনুরূপ ব্যগ্র হওয়া আবশ্যক। স্বদেশী বিস্তারের পথে যত কণ্টক রহিয়াছে

---

* এই বিষয়টী প্রায় ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। তখন যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের অবসরে জাপান তদীয় উৎপন্ন জিনিসে ভারতবর্ষের বাজার 'ছাইয়া' ফেলিয়াছে। না জানি ইহার ফল কি দাঁড়াইবে!

একে একে তাহা উৎপাটন করিতে হইবে। স্বদেশীবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাশক্তির সম্যক্ জাগরণ অনিবার্য্য এবং এই জাগ্রত শক্তি যত রাজ-শক্তির সহিত মিলিত হইয়া (in co-operation) কার্য্য করিবে, ততই প্রজার এবং সাম্রাজ্যের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে স্বদেশী মন্ত্রটী নিতান্ত তুচ্ছ করিবার জিনিষ নহে। এই পথ-ভ্রষ্ট হইলে সভ্যজগতে আমরা অতি অপদার্থ এবং মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতি-পন্ন হইব।

প্রকৃত স্বদেশীর পুণ্যস্রোত ভারতবাসীদের হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া থাকিলে আজ তাহাদিগকে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের জন্য জগতের সমস্ত বণিক্ জাতির অধীন হইতে হইত না। যে মন্ত্রের অভাবে আমরা এইরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছি, শুভক্ষণে সেই মন্ত্র আজ ভগবান্ আমাদের কর্ণে দিয়াছেন। ইহাই আমাদের অস্ত্র এবং ইহাই আমাদের শস্ত্র। এই অস্ত্র পরিচালনা করিতে শিখুন, অভীষ্টসিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। কারণ কথায় বলে "বিষস্য বিষমৌষধম্"। আর যদি অবহেলা পূর্ব্বক আমরা এই সুযোগ ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে আমাদের দশা যে কি ভয়াবহ হইবে তাহা কল্পনারও অতীত।

মৃত্যু ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ।

—:○:—

পীঠস্থান—জাপানীদের জন্ম কিংবা বিবাহের সহিত ধর্ম্মের কোনও সংশ্রব না থাকিলেও, মৃত্যু উপলক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। এই সময়ে যেমন বুদ্ধদেবকে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতির জন্য আরাধনা করা হয়, সেইরূপ পরলোকগত পূর্ব্ব পুরুষগণকেও অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে। এই 'পূর্ব্বপুরুষ-অর্চ্চনা'কে 'শিন্তো' ধর্ম্ম বলে। জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ইহাই তত্রস্থ অধিবাসিদিগের ধর্ম্ম ছিল। এই ধর্ম্মমতে জাপানীরা স্ব স্ব পরিবারস্থ মৃত ব্যক্তিদিগের নাম একখণ্ড কাষ্ঠফলকে লিখিয়া 'খামি দামা'র (দেবতাদিগের পীঠস্থান) উপরে বিলম্বিত রাখেন এবং তাঁহাদের মৃতদেহ একই স্থানে সমাধি দিয়া প্রতিমাসে মিষ্টান্নাদি দিয়া আসিতেছেন। এই প্রথা আজও পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত আছে; কারণ আধুনিক জাপানীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষ-উপাসনা ত্যাগ না করিয়া বরং উহা বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রণে এক অভিনব ধর্ম্মে পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই প্রত্যেক জাপানী গৃহে 'খামি দামা'র পার্শ্বে 'বুৎসু দামা' (বুদ্ধদেবের পীঠস্থান) নামে আর একটী পবিত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মৃতব্যক্তিদিগের নাম 'বুৎসু দামা'র উপরে কাষ্ঠফলকে লিখিত হয়।

জাপানীরা তাঁহাদের পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষদিগকে পরিবারস্থ অন্যান্য জীবিত ব্যক্তিদিগের ন্যায় মনে করিয়া আহারের পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের ('খামি' কিংবা 'বুৎসু' দামার সম্মুখে) উদ্দেশ্যে খাবার রাখিয়া থাকেন। এবং কেহ, কোনও দূরদেশে গমন করিবার সময়ে 'খামি' ও 'বুৎসু দামা'র নিকট

হইতে যেমন বিদায় গ্রহণ করেন,তেমনি দেশে প্রত্যাগত হইলেও সমাধিস্থলে যাইয়া তাঁহাদের প্রতি সম্যক্ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত জাপানীরা 'মাৎসুরী'র অর্থাৎ উৎসবদিনে সমাধিগুলিকে পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া মৃতব্যক্তিগণের স্মৃতি সর্ব্বদাই মনে জাগরূক রাখিতে প্রয়াস পান। এইরূপে প্রত্যেক্ পরিবারের ইতিহাস পুরুষানুক্রমে সযত্নে রক্ষিত হয়।

কোনও স্বদেশ-হিতৈষীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সম্মানার্থে যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে শিন্তো-মন্দির (Shrine) বলে। ইহা সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির কর্ম্মক্ষেত্রে নির্ম্মিত হইয়া তাঁহার নামেই অভিহিত হয়। এই পবিত্র মন্দিরে আপামর সাধারণ লোক গমন করতঃ পরলোকগত মহাত্মার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এবং ইহার প্রাঙ্গনে বাজার বসাইয়া সর্ব্বদাই লোকসমাগমের ব্যবস্থা করা হয়।

জীবিতই হউন, আর মৃতই হউন, সম্রাট্কে জাপানীরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। এবং এই কারণেই প্রতি জাপানীগৃহেই সম্রাট্বংশের জন্যও একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে।

মৃত-সৎকার—বৌদ্ধধর্ম্ম অন্যূন চতুর্দ্দশ শ্রেণীতে (Sects) বিভক্ত। সুতরাং জাপানীরা উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহাদের সকলের আচার পদ্ধতি এক নহে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শবদেহ সমাধি না দিয়া ভারতীয় হিন্দুদের ন্যায় দাহ করিয়া থাকেন। তবে অধিকাংশ শবদেহ সমাধি দেওয়া হয়।

জাপানীরা মৃতদেহ কিরূপে সৎকার করেন তাহা বলিবার পূর্ব্বে আর একটী কথা বলিবার আছে। পুরাকালে সম্রাট্ কিংবা সম্রাট্বংশের কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার সমাধির চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি ভৃত্যকে জীবিতাবস্থায় দাঁড় করাইয়া সমাধি দেওয়া হইত। প্রবাদ আছে যে, সম্রাট্ 'সুইনিন্' এর ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তাঁহার সমাধির চতুর্দ্দিকে যে সকল ভৃত্যকে পুতিয়া রাখা

হইয়াছিল, তাহারা অনেকদিন যাবৎ জীবিতাবস্থায় থাকিয়া মৃত্তিকার মধ্য-হইতে কাতরস্বরে রোদন করায় সম্রাট্ সুইনিনের হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। অনন্তর তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর সমাধিস্থলে কোনও জীবিত ভৃত্যকে না পুতিয়া তৎপরিবর্ত্তে মৃত্তিকার পুত্তলিকা পোতা হইবে। সেই অবধি ভৃত্যকে আর প্রভুর সহমরণে যাইতে হয় না।

অতি প্রাচীনকালে জাপানীরা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃতদেহ সমাধি দিতেন; কিন্তু কতিপয় শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা উহা ২৫ ঘণ্টা গৃহে রাখিয়া আসিতেছেন। অনেক মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থানে লইয়া যাইবার পর পুনর্জ্জীবিত হইয়া গৃহে ফিরিতে শুনা যায়। সুতরাং এক্ষণে ২৫ ঘণ্টা মধ্যে যখন বাঁচিয়া না উঠে, তখন উহা সমাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

মৃতদেহ সমাধি দিবার পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তির মস্তকের চুল ফেলিয়া সাবান দ্বারা গরম জলে গা ধোয়াইয়া দেওয়া হয়। একখানি সাদা 'কিমোনা' (পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ) উল্টাভাবে পরাইয়া শবটীকে একটী নূতন কাঠের টবে বৌদ্ধ পুরোহিতের ন্যায় জোড় হাত করাইয়া এবং দুইটী চক্ষু বুজাইয়া বসাইয়া রাখা হয়। দেখিলে মনে হয়, যেন কে ধ্যানে আত্মহারা হইয়া 'নামু আমিদা বুৎসু' (I adore Thee O Eternal Buddha) বলিয়া জপ করিতেছে! যে টবে মৃতদেহটী সংরক্ষিত হয়, তাহা পুষ্পদ্বারা অতি পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত করা হয়। এবং যে গরম জলে মৃতদেহ ধোয়া হয় তাহাতে কাঁচা জল মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। প্রথমে কাঁচা জল একটী পাত্রে ঢালিয়া তৎপরে উহাতে গরম জল ঢালা হয়। মৃত ব্যক্তির গাত্র ধৌত করিবার জন্য গরম জল যেরূপে ঠাণ্ডা করা হয় (অর্থাৎ কাঁচা জল ঢালিয়া), জীবিত ব্যক্তিগণের ব্যবহার্য্য জল (পানের কিংবা স্নানের) সেরূপে ঠাণ্ডা করা হয় না। এই সময়ে ঠিক বিপরীত উপায় অবলম্বন করা হয়, অর্থাৎ গরম জলে ঠাণ্ডা জল ঢালা হইয়া থাকে।

মৃতদেহ-সৎকার সংক্রান্ত আরও দুই একটী প্রথা জাপানী-জীবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মৃতদেহ গৃহ হইতে বাহির করিয়াই তাঁহারা গৃহদ্বারে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন। এবং গৃহাদি পরিষ্কারভাবে ধৌত করিয়া ফেলেন। কেহ কেহ দরজায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রও ভাঙ্গিয়া থাকেন। গৃহদ্বারে মৃৎপাত্রভঞ্জন এবং অগ্নিপ্রজ্বলনের অর্থ কি পাঠকবর্গ তাহা জানেন কি?

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, টবে মৃতদেহ রাখিবার পর উহার সম্মুখে নানাপ্রকার পূজার উপকরণ আনয়ন করা হয়। প্রদীপ, ধূপ এবং পিষ্টকাদি মিষ্টান্নই এই উৎসবের (ইহাকে ঠিক পূজা বলা যায় না, কারণ ইহাতে পুষ্প চন্দনাদি ব্যবহৃত হয় না) প্রধান অঙ্গ। এই সময়ে পুরোহিত আহুত হইয়া একাধিক বার মৃতব্যক্তির আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। মৃত্যুর ২৫ ঘণ্টা পর শবটীকে যখন চতুর্দ্দোলায় চড়াইয়া বাহকেরা (কুলি মজুরেরা) সমাধিস্থলে লইয়া যায়, তখন পুরোহিত মহাশয়ের জন্যও একখানি সুরম্য চতুর্দ্দোলার বন্দোবস্ত করা হয়। এতদ্ব্যতীত সমাধিস্থলে বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে উপবিষ্ট হইবার জন্য একখানি চিত্রবিচিত্র চেয়ারও সঙ্গে লওয়া হয়। সর্ব্বপ্রথম পুরোহিত মহাশয় বৌদ্ধমন্দিরস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি সমীপে জোড়হস্তে নয়ন মুদিয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনুচ্চস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন; পরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবেরা এক একটু ধূপ হাতে লইয়া মূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে থাকেন। অগ্নি সাধারণতঃ বেদীতে রক্ষিত হয় এবং উহার নীচে চতুর্দ্দোলা সমেত মৃত ব্যক্তিকে (টবের মধ্যে জোড়হস্তে নয়ন মুদিয়া উপবিষ্ট অবস্থায়) রাখা হয়।

মজুরেরাই সমাধি প্রস্তুত করিয়া থাকে। মৃতদেহ সমাধিস্থলে পৌঁছাইয়া দিয়া আত্মীয়স্বজন সকলেই গৃহে ফিরিয়া যান। এই প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে শোকসন্তপ্ত পরিবারস্থ অতি নিকটসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ এই সময়ে সাদা 'কমোনো' পরিধান করিয়া সমাধিস্থলে পিষ্টকাদি লইয়া গমন করেন।

শ্রাদ্ধ—মৃত্যুর পর সাধারণতঃ একচল্লিশ দিন অশৌচ থাকে। ইহার শেষে পুনরায় পুরোহিত ডাকিয়া একটী উৎসবের আয়োজন করা হয়। ইহা অনেকটা আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের ন্যায়। এই সময়ে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে কিংবা বিবাহাদি শুভ কার্য্যেও জাপানীরা আত্মীয়স্বজন এবং নিতান্ত বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন না। সুতরাং আমাদের দেশের ন্যায় একসঙ্গে পাঁচ সাত শত লোকের একত্র ভোজন জাপানে ঘটিয়া উঠে না। বুদ্ধিমান্ কাহারা? আমরা না জাপানীরা? একদা জনৈক শিক্ষিত জাপানী ভদ্রলোক আমাদের দেশের বৃহৎ বৃহৎ ভোজপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বলিলেন, "আমরা ঐরূপ প্রথার বিরোধী। কারণ ঐরূপ ভোজ, নিমন্ত্রণকারী এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা দূরে থাকুক, উহা অনেক সময় অনিষ্টের মূল হইয়া দাঁড়ায়।"

তাঁহার ঐরূপ ধারণার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ভোজের আয়োজন করিতে গৃহস্থের যে কষ্ট হয় তাহা অমানুষিক। আবার যাঁহারা নিমন্ত্রিত হন, তাঁহারা অসময়ে অনিয়মে গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করিয়া অধিকাংশ স্থলেই পীড়াগ্রস্থ হন। সুতরাং এইরূপ একটী অনুষ্ঠান না করিলেই ভাল হয় না কি?"

আমি এই কথার সন্তোষজনক কোনও উত্তর দিতে না পারায় নীরব ছিলাম। এরূপস্থলে পাঠকবর্গের মত কি? আমার অবস্থায় পতিত হইলে তাঁহারা কি উত্তর দিতেন?

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।

পাশ্চাত্য জগতের সংসর্গে জাপানী-সমাজের যেরূপ পরিবর্ত্তন এবং সংশোধন সাধিত হইয়াছে, তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। ইংরাজেরা আমাদের দেশে প্রায় ২০০ বৎসর আসিয়াছেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা তাঁহাদের কি সদ্‌গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি? জাপানীরা ৪০ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত উন্নত এবং সভ্যজাতির গুণসমূহ গ্রহণ করিয়া নিজেদের জাতিগত সদ্‌গুণের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব শক্তি উৎপাদন করিয়াছেন। এত অল্প দিনের মধ্যে জাপানী-সমাজের অধিকাংশ দোষই সংশোধিত হইয়াছে; এক্ষণে জাপানীরা পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে তাঁহাদের সমাজ গঠিত করিতে ব্যগ্র, কিঞ্চিৎ পরিমাণে সফলতা লাভও করিয়াছেন।

সামাজিক * কুসংস্কারের ক্রীতদাস হইয়া যদি জাপানীরা পূর্ব্বকার বর্ণভেদ উঠাইয়া না দিতেন, যদি তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় পাশ্চাত্যদেশে গমন ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করিতেন, তাহা হইলে আজ জাপানের অবস্থা কি শোচনীয় হইত! সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের ন্যায় শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা না হইলে এবং সকলকে প্রজার উপভোগ্য সমস্ত অধিকার তুল্যভাবে না দিলে, জাপান এত অল্প সময়ে এত অধিক উন্নতি কখনই করিতে পারিত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে সমাজ সংস্কার করিয়াই জাপানীরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এশিয়ার অন্য কোনও দেশাপেক্ষা কোনও অংশে ভাল ছিল না।

* মৎপ্রণীত 'সুপ্ত জাপানে' এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

উচ্চবিজ্ঞান-শিক্ষয়িত্রী।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল—এখন দেখা যাউক, পাশ্চাত্য বায়ু জাপানে সঞ্চারিত হওয়ায় জাপানীদের স্বভাবগত দোষগুণসমূহ এবং তাঁহাদের আচার পদ্ধতির কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! পাশ্চাত্য বায়ু পুরুষের গায়েই লাগিয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের গাত্র আজও স্পর্শ করিতে পারে নাই বলিয়া বোধ হয়। অধিকাংশ শিক্ষিত জাপানীই তাঁহাদের জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সাহেব সাজিয়া থাকেন এবং আফিসাদিতে টেবল ও চেয়ার ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুনিতে পাই, অনেকে নাকি পাশ্চাত্য রন্ধনেরও পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। পুরুষগণের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন হইলেও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে উক্ত কোনও পরিবর্ত্তন বড় একটা দৃষ্ট হয় না। ইঁহারা জাপানীভাবেই থাকিতে পছন্দ করেন। আমি স্বচক্ষে কয়েকজন মহিলাকে দেখিয়াছি, ইহাঁরা ইউরোপীয়ান্‌দের সহিত বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি পরিধানের জাপানী 'কিমোনো' ত্যাগ করেন নাই। জাপানী রমণীগণ মেম সাহেবদের ন্যায় স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হন না, শিক্ষিত নব্য জাপানী যুবকগণের নিকট, বিশেষতঃ যাঁহারা পাশ্চাত্য জগৎ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এটী বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। তাঁহারা অন্ধকার রাত্রিতে কিংবা জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে অন্ধকারবিশিষ্ট স্থানে স্ত্রীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বেড়াইয়া সান্ধ্যভ্রমণ জনিত সুখ আংশিক অনুভব করিয়া চরিতার্থ হন। দিবালোক কিংবা আলোকময় স্থানে তাঁহারা স্ত্রীর করস্পর্শ করিয়া ভ্রমণ করিবার সুবিধা বড় একটা পান না।

পাশ্চাত্য সভ্য জগতের সংসর্গে জাপানীদের স্বাভাবসিদ্ধ ভদ্রতার (Politeness) অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি শিক্ষার্থে পাশ্চাত্যদেশে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই তদ্দেশীয় সভ্যতার অনুকরণ করিতে প্রয়াস পান। ফলে এই হইতেছে যে,

তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকেই চলা ফেরা করিতেছেন। এইরূপে জাপানী পরিবারের ব্যয়ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জাপানীরা আস্তে আস্তে সৌখীনতার মায়াজালে বিজড়িত হইতেছেন; তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ইহাঁদের সংসার খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টাও যথেষ্ট হইয়া আসিতেছে। শিল্প এবং বাণিজ্যকে এক্ষণে আর ঘৃণার চক্ষে দেখা হয় না, বরং উহা গৌরবের বিষয় হইয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ নীচবংশোদ্ভব লোকেরা শিল্প এবং বাণিজ্য লইয়া থাকিত এক্ষণে আর সেরূপ নাই। অর্থ উপার্জ্জনের সমস্ত পন্থাই এক্ষণে সাধু বলিয়া বিবেচিত। যিনি যেরূপে ইচ্ছা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহাকে সমাজ কোনও বাধা দিবে না। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে কেহই সমাজের বশীভূত নহে; পক্ষান্তরে উহা প্রত্যেকেরই অধীন। প্রত্যেকই স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিবেন, সমাজ তাহাতে কোনও প্রতিবাদ করিবে না। এইরূপে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের বন্ধন উন্মুক্ত হইয়া এক বৃহৎ অদ্ভুত সমাজে পরিণত হইয়াছে। এই সমাজের কোনও কড়াকড়ি নিয়ম নাই, এবং এই সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের কোনও নির্দ্দিষ্ট আচার পদ্ধতি নাই। দেশ কাল পাত্র অনুসারে সামাজিক সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। জাপানীরা এইরূপ একটী সমাজ গঠনে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া এত শীঘ্র উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছেন। যত দিন ইঁহারা সমাজের বন্ধন ছেদন করিতে অসমর্থ ছিলেন, তত দিন ইঁহারা জগতে অপরিচিত ছিলেন। বন্ধনোন্মুক্ত হইবা মাত্র ইঁহাদের তেজ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়া আশ্চর্য্যজনক ফল উৎপাদন করিয়াছে।

সমাজ-সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেকগুলি কুসংস্কারও সংশোধিত হইয়াছে। কিন্তু সুনিপুণ অস্ত্রচিকিৎসকের ন্যায় জাপানীরা ধর্ম্ম-শরীর হইতে কেবলমাত্র ক্ষত অংশ টুকু ফেলিয়া দিতে সমর্থ হন নাই; ইঁহারা

ক্ষতাংশ কাটিতে কাটিতে প্রায় সমস্ত শরীরই কাটিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মবিশ্বাস দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

খাদ্য বিচার—আহার সম্বন্ধে জাপানীদের আর কোনও বিচার নাই। চীনাম্যানদের ন্যায় ইহাঁরা এক্ষণে প্রায় সমস্ত বস্তুই খাইতে শিখিয়াছেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মভীরু জাপানীগণ জীবহিংসা না করায় মৎস্য মাংসাদি কিছুই ভক্ষণ করিতেন না; কিন্তু এক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই মাংসপ্রিয় হওয়ায় জীবহিংসা আর পাপ বলিয়া বিবেচিত হয় না। বর্ত্তমান জাপানিগণ শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি সমস্তই খাইয়া থাকেন। তবে আরশোলা, ইঁদুর, ব্যাঙ্‌ ইত্যাদি এখনও চলে নাই।

পূর্ব্বে জাপানীরা ভারতবাসিদিগের ন্যায় মাটীতে ভাতের ডিস্ রাখিয়া ভক্ষণ করিতেন এবং পুরুষগণের আহারান্তে রমণীগণ আহার করিতেন। কোনও কোনও গণ্ডগ্রামে এই প্রথা আজও প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীপুরুষ একত্রে আহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সম্মুখস্থ একখানি জলচৌকির উপরে ভাতের বাটী রক্ষিত করিয়া একটী কাষ্ঠের গামলায় ভাত রাখা হয়, এবং উহা হইতে সকলে হাতা কাটিয়া ভাত উঠাইয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ইউরোপীয়ানদের ন্যায় টেবিল ব্যবহার করিলেও চেয়ার আজও পর্য্যন্ত জাপানী-বাড়ীতে বিশেষতঃ অহারের স্থানে স্থান পায় নাই, তবে শীঘ্র পাইবে বলিয়া বোধ হয়।

শিক্ষিত জাপানী—সাধারণ লোকের সহিত শিক্ষিত জাপানীদের ঘনিষ্ঠতা একটু দ্রবীভূত হইয়াছে। ইঁহারা নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের সংস্পর্শ হইতে যতদূর সম্ভব দূর থাকিতে চেষ্টা করেন। অন্যান্য জাপানীদের ন্যায় তাঁহাদের সহিত অমায়িক ভাবে আলাপ-সালাপও করিতে ইচ্ছা করেন না। পাশ্চাত্য বাতাসের কি অপূর্ব্ব গুণ! ইহা জাপানিদিগকেও অহঙ্কারী করিয়া তুলিতেছে।

শিক্ষিত জাপানীরা পল্লী অপেক্ষা সহরে বাস করিতে ভাল বাসেন। অনেকেই পল্লীগ্রামস্থ ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া বাড়ী ভাড়া করিতেছেন। মধ্য শ্রেণীস্থ জাপানীরা কয়েকটী কারণ বশতঃ সহরে আসিতে বাধ্য হন। (১) পৈত্রিক সম্পত্তি সমস্তই জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাপ্ত হন, সুতরাং বিবাহের পর অন্যান্য ভ্রাতাগণকে নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া লইতে হয়। কেহ বা চাকুরী গ্রহণ করিয়া সহরে থাকিতে বাধ্য হন, আবার কেহ বা শ্বশুর বাড়ীতে ঘর-জামাতা হইয়া থাকেন। এই ঘর-জামাই প্রথাটী জাপানে অত্যন্ত প্রচলিত। যাঁহার একটী বা দুইটী কন্যা আছে কিন্তু পুত্র নাই, তিনি কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে পুত্রস্বরূপ গৃহে রাখিয়া দেন। অনেক স্থানে এই সমস্ত গৃহীত জামাতাগণকে পৈত্রিক নাম (family name) ত্যাগ করিয়া শ্বশুর কুলের নাম গ্রহণ করিতে হয়। কন্যাটীকে একজনকে দান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুনরায় গ্রহণ করিয়া উক্ত গৃহীত জামাতার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। আমার * জনৈক জাপ-বন্ধু এই-রূপে গৃহীত হইয়াছেন। তাঁহার পারিবারিক ইতিহাস অতি চমৎকার। (২) জাপানে খুব বড় বড় জমিদারের সংখ্যা অতি কম। যে কৃষক যে জমি চাষ করে, সেই তাহার স্বত্বাধিকারী; সে উহা স্ত্রীপুত্রাদির সাহায্যে চাষ করে এবং গবর্ণমেণ্টকে তজ্জন্য খাজানা দেয়। পূর্ব্বে উৎপন্ন জিনিসের কতক অংশ খাজানা স্বরূপ দেওয়া হইত, কিন্তু এক্ষণে সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। (৩) গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণকে জনসাধরণ খুব সম্মান করে, সুতরাং এই চাকুরী গ্রহণের জন্যও অনেকে সহরে আসিতে বাধ্য হন।

* জাপানে অবস্থান কালে যে মহাত্মার ফ্যাক্টরীতে আমি কার্য্যশিক্ষা করিতাম, তাঁহার নাম 'উরাইয়ামা তারাসু'। তাঁহার সম্বন্ধে মৎপ্রণীত 'জাপান-প্রবাসে' বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৪) এবং সহরে থাকিয়া কারবার করিবার সুবিধা থাকায় অনেক লোক নিজের পল্লীগ্রামস্থ বাটী ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন।

জাপানীরা কোনও খাদ্যদ্রব্য হাত দিয়া স্পর্শ না করিয়া চীনাম্যান্‌দের ন্যায় কাটী দ্বারা উহা তুলিয়া ভক্ষণ করেন। এই কাটীকে 'হাসি' বলে। আহারের সময় ঠিক নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সময়ে যিনি যেখানে থাকেন, নিশ্চয়ই আহার করিবেন। কিন্তু যদি কোনও কার্য্যবশতঃ এমন কোনও স্থানে যাইতে হয়, যেখানে আহার্য্য বস্তু কিছুই পাওয়া যায় না, তাহা হইলে 'বেন্তো' (ভাত ও তরকারী টিনের বাক্স কিংবা কৌটায় পুরিয়া) লইয়া যাইতে হয়। জাপানে আফিস এবং স্কুলেও আহারের জন্য পৃথক্ ঘর আছে। আহারের সময় সকলে, একত্রিত হইয়া সেখানে আহার করিয়া থাকেন।

স্বদেশভক্তি—জাপানীদের সকলেই জন্মভূমিকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিয়া মনে করেন। এক জন্মভূমির প্রতি সকলেরই অগাধ ভক্তি থাকায় ইঁহারা একতাসূত্রে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং দেশের জন্য প্রাণপাত করিতেও কেহ কিঞ্চিৎ মাত্র কুন্ঠীত নহেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত জাপানীদের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য গুণ পরিলক্ষিত হয়। সেটী এই, ইঁহারা সাম্রাজ্যে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য পরস্পর বিবাদ করিলেও বিদেশীয় কোনও জাতি জাপান আক্রমণ করিলে সহসা সকলে একত্র সমবেত হইয়া উহা রক্ষা করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে কমোডর পেরী (Comodore Perry) যখন জাপানে আসেন, তখন জাপানের আভ্যন্তরিণ অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। সে সময়ে জাপানে কয়েকটী দল ছিল এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর ঘোর বিবাদ চলিতেছিল। যদি কোনও দল পেরীর পক্ষ সমর্থন করিয়া শত্রু নাশে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে আজ জাপানের অবস্থা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের ন্যায় হইত। এই

জাতীয় মহাসঙ্কটে জাপানীরা—যাহাদিগকে ভারতবাসিগণ অসভ্য মনে করিতেন—কি করিয়াছিলেন ? আর ভারতবাসিগণ বা তাঁহাদের জাতীয় সঙ্কটে কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন ? উভয়েরই আচরণ ইতিহাসে লিখিত আছে। পেরীর সময় হইতে এ পর্য্যন্ত জাপানীরা তিন বার জাতীয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন ; কিন্তু একবারও একটী জাপানীও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়া স্বদেশের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। একটী জাতির মধ্যে একজন লোকও বিশ্বাসঘাতক নাই (অবশ্য জন্মভূমির প্রতি) ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি থাকিতে পারে ? চীন-জাপান কিংবা রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় এমন একটী লোকের কথা শুনা যায় নাই যে দেশের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শত্রুকে সাহায্য করিয়াছে।

প্রভু এবং পিতৃভক্তির পরিচয় অনেকস্থলে পাওয়া যায়; কিন্তু মাতৃ-ভক্তির উল্লেখ জাপানী সাহিত্যে বড় একটা পাওয়া যায় না। সুতরাং "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী" এই মহাবাক্যটী এখানে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয় না।

জাপানীরা মাতৃ এবং পিতৃভক্তিতে আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও প্রভুভক্তি এবং স্বদেশানুরাগে অদ্বিতীয়। যাঁহারা জননীকে সম্যক্ ভক্তি করিতে পারেন না তাঁহারা কিরূপে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক হইতে পারেন, তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত। প্রায় সমস্ত জাপানীই জন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পাত করিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত মাতৃভক্ত নাই বলিলে বোধ হয় আমার কথায় অনেকেই প্রত্যয় করিবেন না। কিন্তু কৌতূহলপরবশ হইয়া এ বিষয়ের অনেক অনুসন্ধান লইয়াও আমি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় মাতৃভক্ত একজনেরও নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

পূর্ব্বে জাপানীদের যে মহা সমাজের কথা বলিয়াছি স্বদেশ-প্রেম তাহার মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় ইহাঁরা একশ্রেণীভুক্ত লোকের ন্যায় পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাবে আচরণ করিতে পারেন এবং এই কারণেই ইহাঁরা ক্রমশঃ উন্নতি করিতে সমর্থ হইতেছেন। জাপানীরা এক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তেই উন্নতির সোপানের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে উঠিতেছেন। তাহাঁদের সমাজে আজ যে দোষ পরিলক্ষিত হইতেছে হয় তো আগামী কল্যই তাহা আর থাকিবে না। এরূপ অবস্থায় জাপানী-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক্ রূপে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে।

সাধারণ চরিত্র—এ স্থলে জাপানীদের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইহাঁরা অতি ভদ্র এবং নম্র এবং আত্মসংযমে অদ্বিতীয়। দুঃখ কিংবা শোকাভিভূত হইলেও ইহাঁদের মুখ দেখিয়া হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট বুঝা যায় না। ইহাঁরা কাহারও প্রতি বিরক্ত হইলে তাহাকে বিরক্তির ভাব কোনও প্রকারে জানিতে দেন না।

জাপানীরা প্রকৃত স্বদেশী। স্বদেশ শব্দের অর্থ ইঁহারাই বুঝিয়াছেন। দেশ এবং দেশস্থ লোকের প্রতি ইহাঁদের এত অনুরাগ যে ইহাঁদিগকে স্বার্থপর জাতি বলিলেও বলা যাইতে পারে। সমস্ত বিদেশীয়দের প্রতি ইহাঁদের আন্তরিক ঘৃণা আছে বলিয়া বোধ হয়। জাতীয় ধন বৃদ্ধির জন্য সকলেই ব্যগ্র। বিদেশীয়দের পয়সা যে * কোনও উপায়ে দেশীয় ব্যক্তিকে দিতে পারিলেই নিষ্কৃতি, নিজে লাভের অংশ কিছুমাত্র না পাইলেও আপত্তি

---

* ভাষার অজ্ঞতাহেতু কোনও জিনিস খরিদ করিতে কিংবা 'কুরুমা' ভাড়া স্থির করিয়া দিতে কোনও জাপানী ভদ্রলোকের সাহায্য প্রার্থনা করিলে প্রায়শঃ জরিমানা দিতে হয়। যে জিনিস এক টাকায় পাওয়া যায় সেখানে অন্ততঃ দেড় টাকা দিতে হয়। বিদেশীয়গণ ধনী, সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব বেশী মূল্য লওয়া উচিৎ ইহাই তিনি দোকানদারকে বুঝাইয়া দিয়া সাহায্যপ্রার্থীকে উপকার করেন।

নাই, দেশস্থ যে কেহ উহা পাইলেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল বলিয়া মনে হয়। অন্য দেশীয় লোকের পক্ষে এটী দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও এটী জাপানীদের জাতিগত মহৎ গুণ, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। স্বজাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে কয়জন লোক সমান চক্ষে দেখিতে পারেন? জাপানী-হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব নিহিত আছে বলিয়াই তাঁহারা প্রত্যেককেই সমানভাবে দেখিতে পারেন। যদি এক স্থানে দশজন * 'কুরুমা-আ' থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সকলেরই এক মত। তাহাদের মধ্যে কেহই অপর একজনের বিরুদ্ধে কিছু বলিবে না, কিংবা সে যে মূল্য চাহিয়াছে তাহাপেক্ষা কম মূল্যে যাইতে প্রস্তুত হইয়া আগন্তুককে বলিবে না। আমাদের দেশীয় ভাড়াটীয়া গাড়োয়ানগণের ব্যবহার ইহার ঠিক বিপরীত। একজন গাড়োয়ান ॥• আনা চাহিলে অপর আর একজন ।৵• আনায় যাইতে স্বীকৃত হইয়া উপস্থিত হয়। হয়তো আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি ।• আনায় যাইয়া থাকে। গাড়োয়ানগণের মধ্যে একতা এবং ভ্রাতৃভাব নাই বলিয়াই তাহাদের মধ্যে এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়।

অনুকরণপ্রিয়তা—জাপানীরা বড় অনুকরণপ্রিয়। এই কারণে ইউরোপীয়ানগণ ইহাঁদিগকে বানরের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, জাপানী-অনুকরণে একটু বিশেষত্ব আছে। যাঁহাদের নিজেদের কোনও বিষয়ে উদ্ভাবন করিবার (Power of Originality) ক্ষমতা নাই, তাঁহারা অপরের গুণানুকরণ করিয়া কিরূপে মহৎ হইতে পারে তাহা বর্ত্তমান জাপানী-জীবন স্পষ্টই প্রতীয়মান্ করিতেছে। কোনও নূতন বিষয়ে উদ্ভাবন-শক্তি না থাকিলেও যে একটী জাতি জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে তাহা ইতিপূর্ব্বে অপর কোনও জাতির ইতিহাসে ঘটে নাই।

* কুরুমা অর্থাৎ রিক্‌সা গাড়ী, ইহা একজন মনুষ্যে টানে। যে উহা টানে তাহাকে 'কুরুমা—আ' বলে।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে জাপানীদের নিজেদের কিছুই ছিল না। ধর্ম্ম বলুন, সভ্যতা বলুন, শিক্ষা কিংবা ভাষা বলুন, এ সমস্তই জাপানীরা চীন এবং ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোনও বিষয় * গভীর ভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতাও ইহাঁদের ছিল না। এই সমস্ত কারণে ইহাঁদের নিজেদের লিখিত কোনও ভাল পৌরাণিক পুস্তকাদি নাই। বোধ হয় পুরাকালে জাপানীরা বিদ্যার চর্চ্চা এবং অনুশীলন রীতিমত না করায় তাঁহাদের মস্তিষ্ক অপ্রস্ফুটিতই থাকিয়া যাইত। নচেৎ একটী জাতির মধ্যে কাহারও উদ্ভাবন শক্তি না থাকিবার অন্য কি কারণ থাকিতে পারে? বর্ত্তমান জাপানীদিগের অনেকের মধ্যেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সমস্ত বিষয়ই ইহাঁরা অন্যান্য সভ্য দেশ হইতে শিক্ষা করিলেও, অনেক স্থলে অসামান্য Originality দেখাইতেছেন। এড্মিরাল 'তোগো' ইংলণ্ড হইতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিলেও স্বীয় Originalityর প্রভাবে এক বৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট রণপোত প্রস্তুত করাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত 'সাৎসুমা' জাহাজ ইউরোপীয়ান্ শক্তিপুঞ্জের হৃদয়ের স্তরে স্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে।

---

* মনে মনে হিসাব করিবার শক্তি জাপানীদের পুর্ব্বেও ছিল না এবং এখনও হয় নাই। সামান্য একটী যোগ কিংবা বিয়োগ করিতে হইলে হাতের কাছে যদি 'সোরোবান্' না থাকে তাহা হইলেই গোল বাধিয়া যায়। কিন্তু হাতের কাছে 'সোরোবান্' (Counting Board) থাকিলে জাপানীদের নিকট আর কোনও হিসাব বাধে না। নিমেষ মধ্যে বড় বড় হিসাব সম্পন্ন করিয়া ফেলেন। প্রত্যেক জাপানীর আশা এবং আকাঙ্ক্ষা কত উচ্চ তাহা শুনিলে পাঠকবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। ইহাঁরা সকলেই আজ কাল জাপানের আয়তন ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিয়া বলেন যে, ইংলণ্ডের পক্ষে যাহা সম্ভবপর হইয়াছে জাপানের পক্ষেও তাহা অবশ্যই সম্ভব হইবে। কারণ উভয় দেশই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র শীতপ্রধান দ্বীপ।

শুধু জাপানীদের কেন, এসিয়াবাসিদের পক্ষে ইহা একটী কম সৌভাগ্যের কথা নহে। যে সমস্ত উন্নত জাতির অনুকরণ করিয়া বর্ত্তমান জাপান গঠিত হইয়াছে আজ সেই জাপানের নিকট সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহাদিগকে অবনত হইতে হইতেছে।

জাপানী-শিল্প এবং বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া পাশ্চাত্যবাসিগণের মনে বাস্তবিকই আতঙ্ক জন্মিয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় প্রতিযোগিতায় জাপানী-শিল্প অচিরে জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। শিল্প এবং বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি আরও যে না হইবে তাহা কে বলিবে ?

জাপানী-চরিত্রে আর একটু বিশেষত্ব আছে। পাশ্চাত্য দেশ হইতে বড় বড় কলকারখানা দেখিয়া আসিয়া নিজেদের দেশে উহা কিরূপ সহজ-ভাবে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। নিত্য ব্যবহার্য্য অস্ত্রশস্ত্রাদি অতি সুলভ এবং সরলভাবে নির্ম্মিত। উহা ব্যবহার-করণও তদনুযায়ী সহজ। বৃক্ষের যে সমস্ত বড় বড় গুঁড়ি চিরিবার জন্য আমাদের দেশে তিনজন মিস্ত্রি এবং একখানি বৃহৎ করাতের প্রয়োজন হয়, জাপানীরা তাহা একখানি ছোট করাৎ দ্বারা একজন লোক একাকীই স্বচ্ছন্দে কাটিয়া থাকে। কৃষকেরা প্রায়ই একটি গরু কিংবা ঘোড়া দ্বারা ভূমি চাষ করিয়া থাকে। লাঙ্গলগুলি এমনই হাল্‌কা এবং সহজভাবে গঠিত যে উহা টানিবার জন্য দুইটী বলদের কোনই দরকার হয় না।

জাপানে মুটে বলিয়া কোনও শ্রেণীর লোক নাই। 'কুরুমা—আ'গণই উহা টানিয়া থাকে। তবে বৃহৎ বৃহৎ মোট্ কিংবা বোঝা স্থানান্তরে লইতে হইলে 'নিগুরুমা' (অনেকটা আমাদের দেশের গো শকটের ন্যায়; তবে উহা মানুষে টানিয়া থাকে) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ গাড়ীর সাহায্যে একজন লোক ৮।১০ মণ বোঝা অনায়াসে যথেচ্ছা লইয়া যাইতে পারে।

'নি শুরুমাতে' ৫।৬ মণ বোঝা টানিতে অনেক স্ত্রীলোককে দেখা যায়। এই শ্রেণীর গাড়োয়ানগণ সচরাচর নিজেদের জিনিসই টানিয়া থাকে। কচিৎ কখনও অপরের জিনিষ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। এই জন্যই ইহাদিগকে ঠিক্ মুটে বলা যাইতে পারে না।

বস্তুতঃ অধিকাংশ কার্য্যই জাপানীরা এত সহজে এবং স্বল্পায়াসে সম্পন্ন করিয়া থাকেন যে উহা দেখিলে বোধ হয় যেন কোনও কার্য্যই তাঁহাদের নিকট কঠিন নহে।

শান্তি-প্রিয়তা—জাপানীদের একটী মহৎ গুণ এই যে ইহাঁরা তর্কবিতর্ক কিংবা ঝগড়া কলহ বড় একটা করেন না। তর্কবাগীশ বাঙ্গালীদের ন্যায় ইহাঁরা বৃথা তর্ক করিয়া অমূল্য সময় হরণ করেন না। কথাবার্ত্তা বলিবার সময় যদি কাহারও মতের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলেন তিনি তাহাতে রাগ করেন না কিংবা নিজের মত অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য প্রয়াস পান না। 'ছো দেথ্ কা', অর্থাৎ 'তাই নাকি' ? বলিয়াই সে বিষয়ের যবনিকা এখানেই পতন করা হয়। জাপানীদের মধ্যে আমাদের ন্যায় 'রাম বড় কি শ্যাম বড়' ইহাই মীমাংসা করিতে মুখামুখী হইতে হাতাহাতি হয় না। আপনার মতে রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা বড় না হয়, অথচ আমি তাহাকে বড় বলিতে যাই, তাহা হইলেই তর্কের এবং পরিশেষে মনোমালিন্যের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি যদি আপনার মত বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াও আমাকে বলেন 'তাই নাকি মহাশয় ?' তাহা হইলেই বোধ হয় সে বিষয়ের ভাল সিদ্ধান্ত হয় ; কারণ ইহাতে আর আমাকে তর্ক করিবার অবসর না দিয়া বরং চিন্তা করিবার অবসর দেওয়া হয়। আপনার সহিত আমার মতের মিল না হইলে তাহা এইরূপে সিদ্ধান্ত করা ভদ্রোচিত। পাঠকবর্গ, আপনাদের মধ্যে ক'জন এরূপ করিয়া থাকেন ? নিজের মতই ঠিক, আর দশজন বুঝে না, এই ধারণা বোধ হয় আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেরই আছে।

'কুরুমা' অর্থাৎ রিক্সা গাড়ী ।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

এবং এই কারণেই আমরা সহজে একতার সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিতেছি না। ইহা ঠিক নহে কি ?

আমি অনেক দিন একটী জাপানী-পল্লীতে বাস করিয়াছি। ঐ পল্লীর অধিকাংশ অধিবাসীই নিম্নশ্রেণীস্থ লোক। প্রকৃত ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা সেখানে কম ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমার সুদীর্ঘ অবস্থানকালে আমি কাহাকেও অপর কোনও ব্যক্তির সহিত ঝগড়া করিতে দেখি নাই, কিংবা শুনি নাই। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের কথা দূরে থাকুক ভদ্র পরিবারের লোকেরাও যেরূপ ঝগড়া করিতে পারেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। জাপানীদিগের সহিত আমাদের কি পার্থক্য ?

শান্তিরক্ষক—জাপানী পুলিশ সর্ব্বাপেক্ষা নম্র, বিনয়ী এবং ভদ্র। একদা পুলিশের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ (Constables) তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিবার সময়ে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে হইলে, শান্তিরক্ষক পুলিশকে সর্ব্বাগ্রে শিষ্ট ও শান্ত হওয়া উচিত। কারণ ইহাদের আচরণই সাধারণের আদর্শ হইয়া থাকে। এই কথাটীর যাথার্থ্য জাপানে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এখানকার পুলিশ কর্ম্মচারিগণ স্বভাবতঃ ধীর এবং শান্ত। ইহারা প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর ইংরাজী জানে। বিদেশীদিগের সাহায্যের জন্য ইহাদিগকে কিছু কিছু ইংরাজী জানিতে হয়। কাহারও কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হইলে, ইহাদিগকে জানাইলে, ইহারা অতি আগ্রহ সহকারে তাহা করিয়া থাকে। ইহাদের এবং জাপানী সৈনিক পুরুষদিগের আকার প্রকার দেখিলে মনে ভীতির সঞ্চার না হইয়া বরং ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই বেশ শিক্ষিত এবং ভদ্রবংশ সম্ভূত। ইহাদের মনে অহঙ্কারের লেশ মাত্রও নাই বলিয়া বোধ হয়। আমরা কোনও পুলিশ কর্ম্মচারীকে

কোনও অপরাধীকে উচ্চবাক্যে তিরস্কার করিতে পর্য্যন্ত শুনি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জনসাধারণ ইহাদিগকে খুব ভয় করে।

তোকিও হইতে কোবে যাইবার সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে একজন জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত আমার আলাপ হয়। বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধে তাঁহার বাম হাঁটুর মধ্যে একটি গুলি প্রবেশ করায় তিনি এক্ষণে খোঁড়া হইয়াছেন। ইনি জাপ-অশ্বারোহী সৈন্যের (Cavalry) একজন অধ্যক্ষ (General) ; সুতরাং খঞ্জ হইলেও তিনি স্বকার্য্য করিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন না। ইহাঁর নিকট হইতে রুষ-জাপানী যুদ্ধের বিবরণ কিছু কিছু শুনিলাম। ইনি বেশ ইংরাজী জানেন। ইঁহার সহিত খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার বেশ সৌহৃদ্য জন্মিল। আমাদের গাড়ীখানির পশ্চাতে ইঁহার কামরা। ইনি আমাকে সেখানে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং জাপানী-পদ্ধতি অনুসারে 'ওচা' পান করিতে দিয়া তাঁহার অপর দুজন বন্ধুর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। ইঁহারা সকলেই এরূপভাবে আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন যে, আমি যেন বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের পরিচিত ছিলাম। ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ, ইহার আচার-ব্যবহার কেমন, এবং ইংরাজদের প্রতি ভারতবর্ষীয়দের মৌখিক ও মানসিক ভাব কিরূপ এই সমস্ত প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-লেন। আমিও তাঁহাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম অতি আগ্রহের সহিত তাহার উত্তর দিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে রাস্তার উভয় পার্শ্বের সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা আমাকে দেখাইতেছিলেন। আমি যতক্ষণ ইঁহাদের সঙ্গে ছিলাম, ততক্ষণ বিমল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। ইঁহাদের সহিত ভারতীয় সৈনিক ও পুলিশ কর্ম্মচারিগণের কি পার্থক্য ?

রাজ-বিধান—পূর্ব্বে অনেকেই খালি পায়ে যথা ইচ্ছা তথা গমনাগমন করিতেন; কিন্তু আজকাল আর কেহ খালি পায়ে বাটীর বাহির হইতে পারেন না। অতি অল্পদিন হইল,রাজবিধান দ্বারা খালি পায়ে বিচরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যেখানে রাজার স্বার্থ, প্রজার স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে রাজার যে কোনও বিধান প্রজাগণ অম্লানবদনে মানিয়া থাকে। খালি পায়ে থাকিলে শুধু যে অসভ্য বলিয়া ঘৃণিত হইতে হয় তাহা নহে, উহা অতি অস্বাস্থ্যকর। অধিকন্তু পাদুকা পায়ে থাকাতে সহসা পায়ের কোনও অনিষ্ট হইতে পারে না, এই সমস্ত কারণেই জাপ-সম্রাট্ সর্ব্বদা পাদুকা ব্যবহার বিধান করিয়া দিয়াছেন।

জাতিগত দোষ—জাপানীরা এতগুলি গুণের আধার হইলেও তাঁহাদের কয়েকটী দোষ আছে। মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ জাপানীদের মধ্যে সময়ের Punctuality প্রায়ই দেখা যায় না। আহারের সময়টী প্রায়শঃ ঠিক্ থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কাজে Punctuality observe করা হয় না। জাপানীদের মধ্যে এই Punctuality না থাকায় বিদেশীয় বণিক্‌গণকে অনেক সময়ে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কোনও জাপানী ভদ্রলোককে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলে, অধিকাংশ স্থলেই নিজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের হয় পূর্ব্বে না হয় পরে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে গৃহস্থের যে কি অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা তিনি একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না। একদা আমি জনৈক জাপানী বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। বেলা ১টার সময় আমার তথায় উপস্থিত হইবার কথা থাকায় আমি ১২টার সময় তাড়াতাড়ি করিয়া ঝিকে যখন 'কুরুমা' ডাকিতে বলিলাম তখন সে বলিল, 'একটার সময় যাইবার কথা আছে, তবে এত তাড়াতাড়ি কেন? জাপানী বাড়ীতে এক আধ ঘণ্টা অগ্র পশ্চাৎ গেলে দোষ হইবে না। বিদেশীয়গণের ন্যায় আমাদের সময়ের ঠিক্ তত নাই।' দেখিলাম ঝি যাহা বলিয়াছিল বাস্তবিকই তাহা সত্য। আমি ঠিক ১টার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া দেখি কিছুরই বন্দোবস্ত নাই। আমি তথায় পৌঁছিবার আধ ঘণ্টা পর সমস্ত যোগাড় হইতে লাগিল। জাপানীদের Unpunctualityর এরূপ

দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। এরূপ একটী উন্নত জাতির মধ্যে এ দোষটী না থাকিলেই ভাল হয়।

জাপানীদের আর একটী দোষ আছে। পরোক্ষ নিন্দা করিতে ইঁহারা ভাল বাসেন বলিয়া বোধ হয়। কোনও আগন্তুকের গুণ বর্ণনা করা অপেক্ষা তাহার দোষ আলোচনা করাই জাপানী গৃহস্থগণের অভ্যাস। আমি অনেক গৃহস্থেরই এই দোষ দেখিয়াছি। অবশ্য আমারও অদৃষ্টে কি দুই একটী মন্দ কথা না হইয়াছে! তবে সেগুলি পরোক্ষে তাই মঙ্গল!

আমোদ-প্রমোদ।

জাপানীরা স্বভাবতঃ অতি আমোদপ্রিয়। ফলতঃ তাঁহারা আমোদ-প্রমোদ করিয়াই জীবন কাটাইয়া দেন। জগতে এমন কোনও নৈসর্গিক দুর্ঘটনা বা পারিবারিক দুরবস্থা নাই যাহাতে জাপানীরা একেবারে অভি-ভূত হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতে পারেন। শারীরিক বা মান-সিক অসুস্থতা জাপানীরা কাহাকেও জানিতে দেন না। ইঁহারা সহ্য-গুণের প্রতিমা এবং এই কারণেই বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ ইঁহাদের জীবনে সম্ভবপর হইয়াছে।

জাপানীরা প্রাকৃতিক শোভা এবং ফুল অত্যন্ত ভালবাসেন। 'আকি' অর্থাৎ হেমন্ত ঋতুতে যখন নানা জাতীয় ফুল প্রস্ফুটিত হয় তখন জাপা-নীরা আমোদে আত্মহারা হইয়া উঠেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সময়ে দলে দলে সকলে প্রসিদ্ধ ফুলবাগানে অথবা পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়ান। তখনকার সাজ সজ্জাও সময়োপযোগী। অতি চিত্র বিচিত্র রং-এর 'কিমোনো' পরিধান করিয়া জাপ-রমণীগণ যখন চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান তখন তাঁহাদিগকে প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়। প্রজাপতিকুল মধু অন্বেষণে যেমন ফুলবাগানে উড়িয়া বেড়ায় এবং এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বসিতে থাকে জাপানীরাও তদনুরূপ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। মাঠে রাই কিংবা সরিষার ফুল ফুটিলে জাপানীরা অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াও দেখিবার জন্য সহর হইতে দলে দলে তথায়

যাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন জোনাকি পোকা ধরিবার জন্ম খাঁচা হস্তে অনেক জাপানীকে অন্ধকার রাত্রিতেও ময়দানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। পাঠকবর্গ, ভাবিয়া দেখুন মন কত প্রফুল্ল থাকিলে শিশুগণের স্থায় প্রাপ্তবয়স্ক লোকেও এরূপভাবে আমোদ প্রমোদ করিতে পারেন!

পুষ্পপ্রদর্শনী—বড় বড় সহরে প্রতিবৎসর ফুলের এক একটী প্রদর্শনী করা হয়। সেখানে ফুলের ঘর, বাড়ী, মানুষ, গাড়ী, ঘোড়া, পোষাক পরিচ্ছদাদি দেখিতে পাইবেন। এই প্রদর্শনী হইতে জাপানীদের পুরাকালীন জীবনের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। 'সামুরাই' অর্থাৎ যোদ্ধাগণ পুরাকালে কিরূপ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন এবং তাঁহারা কিরূপ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইতেন তাহা সমস্তই ফুলদ্বারা প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শিত হয়। ফুলগুলি এরূপভাবে সাজাইয়া মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া হয় যে উহা মাসাবধিকাল সজীব অবস্থায় থাকিয়া দর্শকগণের চিত্ত প্রসাদন করে।

বনভোজন জাপানীদের একটা নিত্য নৈমিত্যিক কাজের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কার্য্য হইতে একটু অবসর পাইলেই আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব মিলিত হইয়া কে কোথায় চলিয়া যান। এই সময় পর্ব্বত-আরোহণ এবং সমুদ্র-সন্তরণ করিতে অনেককে দেখা যায়। 'বেন্তো' অর্থাৎ আহার্য্য বস্তু চীনের বাক্সে করিয়া 'ফুরোসিকি' অর্থাৎ রুমালে জড়াইয়া গৃহ হইতেই লইয়া যাওয়া হয়, সুতরাং আহারের সময় হইলেই যে যেখানে থাকেন খাইতে বসিয়া যান। ঠিক্ বনভোজন বলিলে আমরা যাহা বুঝি জাপানে তাহার প্রচলন নাই, অর্থাৎ তাঁহারা বনে জঙ্গলে যাইয়া রন্ধনাদি করেন না।

নাট্যশালা—জাপানে নাচ গান এবং থিয়েটারাদি কৌতুক গৃহ সর্ব্বদাই শ্রোতা ও দর্শকগণের জন্ম উন্মুক্ত। কিবা রাত্রি কিবা দিন সকল সময়েই থিয়েটার চলিতেছে; যিনি যখন অবসর পাইতেছেন তিনিই তখন সেখানে যাইতেছেন।

এই থিয়েটার পাড়াটী সর্ব্বদা এমন জনপূর্ণ যে দেখিলে বোধ হয় সহরের অর্দ্ধেক লোক সেখানে সমবেত হইয়াছেন। এখানে ধনী এবং দরিদ্রের বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকল প্রকার লোকই দৃষ্ট হয়। ইহাতেই বুঝা যায় জাতি হিসাবে জাপানীরা কিরূপ আমোদপ্রিয়।

গেইসা—'গেইসা' বলিয়া জাপানে এক শ্রেণীর নর্ত্তকী আছে তাহারা অনেকটা আমাদের দেশের বাইজীদের ন্যায়। দরিদ্র গৃহস্থের সুন্দরী কন্যা ক্রয় করিয়া এই ব্যবসা শিক্ষা দেওয়া হয়। ক্রেতার গৃহে অবস্থিতির কাল অনুপাতে তাহাদের মূল্য নিরূপিত হয় এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে কেহ কেহ পুনরায় পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করতঃ বিবাহাদি করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কাহাকেও চলিয়া আসিতে হইলে মূল্যের কিয়দংশ ফেরৎ দিতে হয়। এরূপ অনেক দেখা যায় যে 'গেয়সা'গণ নৃত্যগীতাদি করিবার সময় অনেক যুবকের চিত্তহরণ করিয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া ফেলে। সমাজের কোনও বাধা না থাকায় এরূপ বিবাহের অন্য কোনও প্রতিবন্ধক নাই। গুরু শিষ্য, পিতা পুত্র, এমন কি স্বামী স্ত্রী একত্র হইয়াও জাপানীদিগকে গেইসা-গৃহে যাইয়া নৃত্যগীতাদি উপভোগ করিতে দেখা যায়। এরূপ আর কোনও দেশে দেখা যায় কি ?

তোকিয়োর 'ইয়োশিহারা' অর্থাৎ বেশ্যা পাড়া একটী দেখিবার স্থান। গনিকাগণের থাকিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে একটী উৎকৃষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং প্রতি সপ্তাহে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। গেইসাগণের ন্যায় এই গণিকাগণও দরিদ্র ঘরের কন্যা। সংসারে অভাব হেতু অনেক মাতা পিতা কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে ইহারাও পিতৃগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিবাহাদি করিয়া থাকে। যে সমস্ত বালিকা পিতৃঋণ পরিশোধার্থ স্বেচ্ছাক্রমে আত্ম-বিক্রয় করে সমাজে তাহারা অনেক সময়ে প্রশংসিত।

জাপানের বেশ্যা পাড়াটি পরিস্কার এবং পরিচ্ছন্ন এবং বড় বড় রাস্তার ধারে। ইহার পার্শ্বেই ধর্ম্মমন্দিরও পরিদৃষ্ট হয়। যে গৃহে গণিকাগণ বাস করে তাহা বেশ ফিট্ ফাট্ এবং প্রশস্ত। 'ইয়োশিহারা' দেখিবার জন্য বিদেশীয়মাত্রেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মাতা ও শিশু—জাপানী-মাতা শিশুদিগকে নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহারা নিত্য নূতন খেলনা, পুতুল ইত্যাদি শিশুগণকে প্রদান করেন এবং নিজেরা তাহাদের খেলায় যোগদান করিয়া বালকবালিকাগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

স্বামীর সুখবর্দ্ধনের জন্য জাপ-বালিকাগণকে লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-গীতাদিও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শুধু সংসারকার্য্য এবং সন্তান-লালন পালন শিক্ষা করিয়াই তাহাদের শিক্ষার শেষ হয় না। সংসারকে সুখময় করিয়া তোলাই জাপ-রমণীগণের অন্যতম কর্ত্তব্য।

আধুনিক ধর্ম্ম।

—:*:—

এই ঘোর কলিযুগে জগতের অন্যান্য জাতির মধ্যে ধর্ম্মভাব যেরূপ শিথিল হইয়া গিয়াছে জাপানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। জাপানীরাও যে ভারতীয় হিন্দুগণের ন্যায় ধর্ম্মভীরু ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। জাপানে এমন কোনও প্রসিদ্ধ স্থান নাই যেখানে ধর্ম্মমন্দির নাই। এই-গুলি আকার প্রকারে এবং শিল্পচাতুর্য্যে অনেকস্থলে রাজ-প্রাসাদকেও পরাস্ত করে। সাধারণ জাপানীদের ধর্ম্মের প্রতি কিরূপ অনুরাগ ছিল তাহা ইহা হইতে অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। মন্দির নির্ম্মাণে জাপানীরা যত অর্থ ব্যয় করিতেন বুঝি বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে সেরূপ করিতেন না।

জাপানে আজকাল চারিটী ধর্ম্ম প্রচলিত। তন্মধ্যে * শিন্তো অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষ-উপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং ইহাই জাপানীদের নিজস্ব ধর্ম্ম। অপর তিনটীর তুলনায় এইটীই আজও একটু সজীব আছে; কারণ মৃতব্যক্তির স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য প্রত্যেক পরিবারেই ব্যবস্থা আছে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষী তাঁহাদের এবং প্রত্যেক মৃত সম্রাটের উদ্দেশ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ মন্দির এখন আর নূতন করিয়া প্রস্তুত বড় একটা হয় না; কিন্তু শিন্তো মন্দির মধ্যে মধ্যে প্রায়শঃ নির্ম্মিত হইতেছে।

---

* এই বিষয়টীর বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত 'সুপ্তজাপানে' দ্রষ্টব্য।

খৃষ্টান্ পাদরীদের বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় এবং অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিবার পর, এযাবৎ প্রায় লক্ষাধিক জাপানী উক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু উহার মধ্যে অধিকাংশই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে খৃষ্টান্ হইয়াছেন। খৃষ্টান্ না হইলে পাশ্চাত্যদেশ হইতে আশানুরূপ সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যায় না বলিয়া অনেক জাপ-যুবক খৃষ্টান্ হইয়া থাকেন। ইঁহারা আবার স্বদেশ-প্রত্যাগত হইলেই পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম মানিয়া চলেন। তখন খৃষ্টান্ নাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্ব স্ব পারিবারিক নাম ব্যবহার করেন।

ধর্ম্মবিশ্বাস—ধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাস আজকাল খুব কম জাপানীরই আছে। নিতান্ত অশিক্ষিত এবং পাড়াগেঁয়ে লোকের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি সামান্য একটু অনুরাগ দৃষ্ট হয়, তাহাও আর বেশী দিন থাকিবে না। জাপানে * দেবদেবীর সংখ্যা অন্যূন আট লক্ষ হইলেও জাপানীরা নিরীশ্বরবাদী। নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, ঘর, দরজা, ধন দৌলৎ, এমন কি রসুই ঘরের উনানের পর্য্যন্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ পুরুষ, কেহ বা স্ত্রী। জাপানের সম্রাটও একজন দেবতা। তিনি সূর্য্যদেবীর অংশ-সম্ভূত। এতগুলি দেবদেবী থাকিতেও জাপানীরা ক্রমশঃ ঘোরতর নাস্তিক হইয়া উঠিতেছেন। এখন আর কোনও ধর্ম্মে তাঁহাদের আস্থা নাই। দেবতাগণ আর তাঁহাদের পূজা পাইতেছেন না। প্রসিদ্ধ পীঠস্থানগুলি

---

* এই দেবতাগণের মধ্যে কেহ নীল, কেহ লাল, কেহ ধূসর এবং কেহ বা পীতবর্ণের। ইঁহাদের কাহারও পায়ে দুইটী অঙ্গুলী। 'কামুন' নাম্নী জনৈকা দেবীর অনেকগুলি মুখ এবং একসহস্র হস্ত। ইনি দয়া এবং দাক্ষিণ্যের অবতার।

'নিক্কো'তে একখানি পাথর আছে তাহা স্পর্শ করিলে নাকি বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়।

এখন দর্শকগণের নয়ন রঞ্জন করে মাত্র, ভক্তগণের হৃদয় আকর্ষণ করে না।

কোনও ধর্ম্মে সেরূপ বিশ্বাস এবং আস্থা না থাকায় আধুনিক শিক্ষিত জাপানীগণ নাস্তিকত্বের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন। এই যে এত বড় একটী বিশ্বজগৎ ইহা আপনিই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আপনিই বিলুপ্ত হইবে ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস।

পরলোক-বিশ্বাস জাপানীদের নাই। মৃত্যুর পর আত্মা নির্ব্বাণত্ব প্রাপ্ত হয় ইহাই তাঁহারা সার বুঝিয়াছেন এবং তদনুসারে ইহলোকে কাজ করিয়া যাইতেছেন। কর্ম্মফলের প্রতি তাঁহাদের আদৌ দৃষ্টি নাই। জানি না, এইরূপে একটী জাতি কতদিন থাকিতে পারে। বস্তুতঃ জাপানীদের এখন এরূপ অবস্থা যে তাঁহারা যে ধর্ম্মের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাহাই তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। এ সম্বন্ধে আমরা আর্য্য সমাজের নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি কি? তাঁহারা একদল প্রচারক জাপানে পাঠাইয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি?

সামরিক বিভাগ।

—:*:—

বলা বাহুল্য অন্যান্য বিষয়ের মত এদিকেও জাপানীরা আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে জাপানে অন্যূন এক লক্ষ সৈন্য যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত; এতদ্ব্যতীত প্রায় আশি হাজার রিজার্ভ সৈন্য আছে। নৌ-বিভাগও প্রয়োজনানুরূপ করা হইয়াছে। জাপান এখন এশিয়াখণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শক্তিশালী দেশ।

নৌ-শক্তি—রণপোত প্রস্তুত, পরিচালনা এবং নৌ-সেনা গঠনে ইংলণ্ড জাপানকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত লোক আসিয়া জাপানে Naval College স্থাপন করেন এবং জাপানীদিগকে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগত হন। অবশ্য এই সব লোককে জাপ-গভর্ণমেণ্ট যথোচিত বেতনাদি দিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত জাপানের নৌ-বিভাগে দুই একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী আছেন।

জাপানের নৌ-শক্তি অতি অল্প সময়ে আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপানী নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারী এবং নাবিকগণের অসীম সাহস ও রণকৌশল সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তাই আজ জাপান সভ্যজগতে প্রথম শ্রেণীর শক্তি বলিয়া পরিগণিত।

সাধারণ সৈন্য—পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য (Infantry and Cavalry) জাপান ফ্রান্স এবং জর্ম্মাণির অনুকরণে গঠন করিয়াছে। এখন জর্ম্মাণির ন্যায় জাপানেও রাজবিধানানুযায়ী প্রত্যেক যুবককে সামরিক বিভাগের কাজ শিক্ষা করিতে হয়।

এই শিক্ষার কাল অন্ততঃ তিন বৎসর। জাপ-যুবকের বয়স ১৮ আঠারো বৎসর হইলেই তাহাকে যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষা করিতে হয়। যাহারা দেশরক্ষার্থে উক্ত বিদ্যাশিক্ষা করে তাহাদিগকে অন্ততঃ নয় বৎসর সামরিক বিদ্যালয়ে থাকিতে হয়।

মাতাপিতার একমাত্র পুত্রকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয় না। আর যে যুবক উহা শিখিতে অনিচ্ছুক তাহাকে অন্ততঃ ৮১০৲ আট শত দশ টাকা জরিমানাস্বরূপ গভর্ণমেণ্টকে দিতে হয়। এইরূপে সামরিক বিভাগ হইতে ছাড় পাইবার উপায় থাকিলেও জাপ-যুবকেরা তাহা করিতে প্রয়াস পায় না। তাহারা বরং অতি আগ্রহের সহিত উক্ত কার্য্যে যোগদান করে। শারীরিক কোনও দোষবশতঃ অথবা অন্য কোনও কারণে যে যুবকগণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সৈনিকের কাজের অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহারা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে। ইহাতেই বুঝা যায় যোদ্ধা হইবার ইচ্ছা জাপ-যুবকগণের কিরূপ প্রবল।

অতি পুরাকাল হইতেই জাপানীরা যুদ্ধবিদ্যাকে অতি সম্মানার্হ কাজ বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। জাপানী * সামুরাইগণের স্বদেশ-ভক্তি এবং সাহসের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ জাপানের যেটুকু ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা কেবল এই সামুরাইগণের কীর্ত্তি কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

---

* এই সামুরাইগণের বিষয় মৎপ্রণীত যুদ্ধ-জাপানে বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

প্রধান নগর।

জাপানের রাজধানীর সংখ্যা অন্যূন ষাট্‌টী হইবে। ইহা জাপানীদের কুসংস্কারের ফল। একজন সম্রাটের মৃত্যু হইলেই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত 'মিকাদো' সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র রাজধানী স্থাপন করিতেন। বর্ত্তমান 'মেজি' অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপে অনেকগুলি রাজধানীর উদ্ভব এবং তিরো-ভাব হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই এখন সামান্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

'নারা' অনেকদিন জাপানের রাজধানী ছিল। তৎপরে 'কিয়োতো' এবং এক্ষণে 'তোকিয়ো' রাজধানী হইয়াছে।

তোকিয়ো—'তোকিয়ো' অর্থাৎ পূর্ব্ব-রাজধানী। 'মেজি' অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহাকে যেডো (Yedo) বলা হইত। পূর্ব্বে উহা সামান্য একটী মৎস্য ধরিবার আড্ডা ছিল। ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে একজন যোদ্ধা সেখানে সর্ব্বপ্রথম একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। পরে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে 'ইয়েয়াসু' যখন * সোগুণ হন তখন 'যেডোকে' রাজধানী করা হয়। অনন্তর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ 'মেজি' অব্দের প্রারম্ভে 'মিকাদো' এখানে আসিয়া 'যেডো' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উহা 'তোকিয়ো' নামে অভিহিত করেন।

তোকিয়োর, তথা সমগ্র জাপানের গৃহাদি কাষ্ঠনির্ম্মিত ; সুতরাং সেখানে

---

* ইহাঁদের সম্বন্ধে সবিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত যুগ-জাপানে দ্রষ্টব্য।

আগুণের খুব প্রাদুর্ভাব। বড় বড় সহরে প্রায় প্রত্যহ আগুণ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে একদিকে গৃহ ভস্মসাৎ হইতেছে অন্যদিকে ভাল ভাল নূতন গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে। আজকাল ইঁট এবং পাথরের বাড়ীও অনেক হইতেছে। ফলতঃ আগুণই জাপ-গৃহাদির উন্নতির মূল। এই-জন্য জাপানে একটী প্রবাদ আছে যে 'আগুণ যেডোর ফুল'।

তোকিয়ো সহরটী অতি বৃহৎ। উহার পরিধি প্রায় দশ বর্গমাইল। সমগ্র জগতে তোকিয়ো আয়তনে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চৌদ্দলক্ষ।

মিকাদোর প্রাসাদ সহরের ঠিক্ কেন্দ্রস্থলে। ইহার চতুর্দ্দিক পাথরের প্রাচীর এবং বড় বড় দীঘি। এইরূপ তিনটী গড় পার হইলে সম্রাটের প্রাসাদ। পূর্ব্বে প্রথম এবং দ্বিতীয় গড়ের ভিতর * 'দাইমিও'গণ বাস করিতেন এক্ষণে সেখানে সরকারী কয়েকটী আফিস্ এবং শত্রুপক্ষের নিকট হইতে সংগৃহীত অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্রদর্শিত হয়।

তোকিয়োর প্রায় মাঝামাঝি স্থানে 'নিহনবাসী' অর্থাৎ প্রথম সূর্য্য-রশ্মিপাতের সেতু। এইস্থান হইতে সহরের এবং অন্যান্য স্থানের দূরত্ব স্থির করা হয়।

সহরের দক্ষিণ দিকে 'শিবা' উদ্যান। এখানে কয়েকজন 'সোগুণে'র সমাধি দিয়া সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যভাগ বিচিত্র কারুকার্য্য-শোভিত। সহরের উত্তর দিকে আর একটী উদ্যান আছে সেখানেও কতকগুলি সোগুণের সমাধি আছে। এতদ্ব্যতীত সেখানে যাদুঘর, লাইব্রারি, ভৈষজ্য উদ্যান (Botanical Garden) এবং বিশ্ববিদ্যালয়াদিও আছে। জাপান-ভ্রমণকারীমাত্রই এই স্থানটী পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

* 'দাইমিও' সম্বন্ধে আলোচনাও সুপ্ত-জাপানে করা হইয়াছে।

কিয়োতো প্রাসাদ।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

কিয়োতো—কিয়োতো অর্থাৎ রাজধানী। ইহা তোকিয়ো হইতে প্রায় ৩৩০ মাইল দূরে। কিয়োতো সহরটী সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত; কিন্তু উহার চতুর্দ্দিক জঙ্গলময় পর্ব্বত। এখানকার রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত না হইলেও বেশ সোজা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানকার প্রাসাদটীকে 'শান্তি-নিকেতন' বলা হয়। ইহার দেওয়াল কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং ছাদ বৃক্ষত্বকের। দেওয়ালের গায়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা এবং মেজের 'তাতামী' গুলি (মাদুর বিশেষ) অতি পরিপাটী। এই প্রাসাদটী পূর্ব্বে কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হইত না; কিন্তু আজকাল উহার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত।

কিয়োতো ধর্ম্মমন্দিরের আধিক্য হেতু প্রসিদ্ধ। এখানে একটী বৃহৎ ঘণ্টা আছে, তাহার উচ্চতা ১৮ ফিট্ অর্থাৎ ১২ হাত। কিয়োতোর বৌদ্ধ মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

ওসাকা—ওসাকা শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। ইহার আয়তন তোকিয়ো হইতে কিছু ছোট। লোক সংখ্যা প্রায় ৮২০০০০ হইবে। ওসাকায় প্রায় সর্ব্বপ্রকার জিনিসই প্রস্তুত হয়। সহরটী তত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে। চতুর্দ্দিকেই শিল্পাগার; কোথাও ধূম উঠিতেছে, কোথাও গগণভেদী শব্দ হইতেছে, আবার কোথাও গৃহস্থের রমণীগণ অন্দরে বসিয়া নিস্তব্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিতেছেন। এখানকার লোক সর্ব্বদাই ব্যস্ত, কেহই চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। যাহাতে একটু সময়ও বৃথা নষ্ট না হয়, তাহার জন্য সকলেই যেন ব্যগ্র। সহরের মধ্যে যাতায়াতের নানারূপ বন্দোবস্ত আছে। 'কুরুমা' ব্যতীত ট্রাম, রেল, মোটর এবং ছোট ছোট ষ্টীমার শত শত আরোহী লইয়া সর্ব্বদাই ছুটাছুটী করিতেছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

ওসাকা সহর সমুদ্র হইতে একটু দূরে অবস্থিত; সুতরাং বিদেশীয়গণের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য প্রায়শঃ 'কোবে' বন্দর হইতে করা হয়।

অভ্যুত্থান।

—:০:—

বুসিদো—যে কোনও জাপ-যুবককে জাপানের সহসা অভ্যুত্থানের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সহাস্যবদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবেন যে, "বুসিদো" (Spirit of the Knights) ইহার প্রধানতম কারণ। আমার বোধ হয়, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার এবং সমস্ত বিভিন্ন জাতিকে একত্রিভূত করিয়া এক মহাজাতিতে পরিণতকরণ ইহার অন্যতম কারণ। পরলোকগত প্রজাবৎসল 'মিকাদো মাৎসুহিতো' সাধারণের শিক্ষার এরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, সমগ্র জাপানে এখন একজনও নিরক্ষর লোক পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। আধুনিক প্রত্যেক জাপানীই, স্ত্রী হউন আর পুরুষ হউন, ভদ্র হউন আর অভদ্র হউন, ধনী হউন আর নির্ধনী হউন, সকলেই স্বল্প বিস্তর শিক্ষিত। পুরাকালে (অর্থাৎ বর্ত্তমান মেজি অব্দের পূর্ব্বে 'সোগুণ'গণের প্রাধান্য সময়ে) উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ জাপানীই অশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ায় তাঁহাদের জাতিগত তেজ (National spirit) জাতীয় একতার সহিত লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। শিক্ষার প্রভাবে সেই নির্ব্বাপিত তেজ পুনরুদ্দীপ্ত হওয়ায় আজ জাপানীরা জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, জাপানীদের এই জাতিগত তেজের উৎপত্তি কোথায়? পুরাকালে ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের ন্যায় জাপানে যুদ্ধ ব্যবসায়ী একজাতীয় লোক ছিলেন। তাঁহাদিগকে 'সামুরাই' বলা হইত। এই

সামুরাইগণের সংখ্যা অন্যূন কুড়ি লক্ষ ছিল। ইঁহাদের কি কি সদ্‌গুণ ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে উল্লিখিত 'বুসিদো' শব্দের অর্থটী ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক।

পুরাকালীন সামুরাইগণের কতকগুলি অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী ছিল। তাহার কোনটীর ব্যতিক্রম হইলে, তাঁহাদিগকে পবিত্র সামুরাই-সমাজচ্যুত হইয়া, 'রোণিন্' হইতে হইত। বলবীর্য্য এবং সাহসে ইঁহারা অতুলনীয় হইলেও ভদ্রতা এবং নম্রতার আদর্শস্থানীয় ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ন্যায়পরায়ণতা, উদারচরিত্রতা, নির্ভীকতা, সহিষ্ণুতা, আত্মসংযমতা এবং স্বদেশপ্রেমিকতা ইত্যাদি অতি উচ্চ সদ্‌গুণসমূহ ইঁহাদের নিত্য সহচর ছিল। এই সমস্ত গুণালঙ্কৃত হইয়া, ইঁহারা যেরূপ আচরণ করিতেন, তাহাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে 'বুসিদো' বলা যায়।

ধর্ম্ম হইতেই এই 'বুসিদো'র উৎপত্তি। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইতে জাপানীরা স্বার্থত্যাগী এবং অদৃষ্টাবলম্বী হইতে শিখিয়াছেন। শিন্তো ধর্ম্ম (Ancestor worship) তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব পুরুষগণ এবং প্রকৃতিকে পূজা করিতে শিক্ষা দিয়াছে। এই ধর্ম্মমতে তাঁহারা সম্রাট্‌কে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং জাপানকে তাঁহাদের মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার আবাসভূমি বলিয়া মানিয়া থাকেন। এবং এই কারণেই তাঁহাদের রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রেম জগতে অতুলনীয়।

নীতিশিক্ষা—কন্‌ফিউসিয়াস্ নামক জনৈক বিখ্যাত চীনদেশীয় নীতি-প্রচারকের নিকট হইতে জাপানীরা প্রভু ও ভৃত্যের, পিতা ও পুত্রের, স্বামী ও স্ত্রীর, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার, এবং বন্ধুগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ হওয়া আবশ্যক, তাহা শিক্ষা করিয়াছেন।

পুরাকালে ইচ্ছা করিলেই যে কেহ 'সামুরাই' হইতে পারিতেন না। সামুরাই-বংশোদ্ভব হইলেও উল্লিখিত সমুদয় গুণ না থাকিলে সামুরাই হওয়া

যাইত না। বর্ত্তমান 'মেজি' অব্দ হইতে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে সকলেই সৈনিক পুরুষ হইয়া স্বীয় স্বীয় গুণগ্রাম প্রদর্শন করিতে পারেন।

যে সমস্ত গুণালঙ্কৃত হইয়া সামুরাইগণ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনটীরই অভাব বর্ত্তমান জাপানীদের নাই। এই সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আমাদিগকে বেশী দূর যাইতে হইবে না। বিগত রুষ-জাপান-যুদ্ধবিবরণ যিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই এই উক্তির সমর্থন করিবেন, সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান জাপানীদের প্রকৃত প্রকৃতি বুঝিবার জন্য আমি তাঁহাদের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতাম। রুষ-জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা যাহা বলিতেন নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম দিলাম।

মহানুভবতা—মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে প্রথম যখন রুষিয়ান্‌দিগের সহিত জাপানীদের বিবাদের সূত্রপাত হয়, তখন জাপানীরা ভূয়ো ভূয়ো ন্যায়বিচারের জন্য রুষিয়ান্‌দিগকে বলিয়াছিলেন; কিন্তু সাম্রাজ্য-মদ-গর্ব্বিত রুষিয়ান্‌গণ এই ন্যায়সঙ্গত যুক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তাঁহারা সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য নানা প্রকারে জাপানীদিগকে উৎপীড়ন করিতে সংকল্প করিলেন। এই সময়ে জাপানীরা সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। যাহাতে যুদ্ধ করিয়া কতকগুলি লোক বৃথা সংহার না হয়, তজ্জন্য জাপানীরা রুষিয়ান্‌দিগকে বারংবার বলিয়াছিলেন। ইহাতেও রুষিয়ান্‌গণ ক্ষান্ত না হওয়ায়, অবশেষে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। যুদ্ধকালে জাপানীরা কিরূপ সাহসিকতা, নির্ভীকতা, রাজভক্তি এবং স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন জগতের কেহই তাহা অবিদিত নহে। এ সম্বন্ধে রুষ জেনারেল কুরোপাট্‌কিন্ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ যোগ্য।

The causes of Russia's defeat, says General Kuropatkin, in his story of the war, are as follow :—

"The total number of troops put in the field against Russia was over 1500,000 or more than three times the number anticipated by the Russian head-quarter-staff. But the mistake as to number was more than paralleled by the complete failure to appreciate the moral backbone of the Japanese cause—the nation's belief in, and respect for the army, the individual willingness and pride in serving, the iron disciplines maintained among all ranks and the influence of the *Samurai* spirit.

"It was with an army of very different fibre that the Russian Government had to face the whole mankind of Japan responding with unanimous enthusiasm to call to arms."

শত্রুর প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল। জাপানীরা রুষ-বন্দীদিগকে অতি অমায়িকভাবে সেবা করিয়া, তাহাও দেখাইয়াছেন। জাপানীবন্দীগণ রুষ-হস্তে নিপীড়িত হইতেছিল, শুনিয়াও জাপানীরা রুষ-বন্দীদিগের উপর একটুও অত্যাচার করেন নাই। ইহাপেক্ষা মহানুভবতার দৃষ্টান্ত জগতে আর কোথায় দৃষ্ট হইয়াছে কি ?

যুদ্ধের শেষাবস্থায় যখন উভয় জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থিত হইল, তখন জাপানীরা বিজয়ী হইলেও শত্রু পক্ষের অযথা আবেদন মঞ্জুর করিয়া যে উদারচরিত্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া জগতের লোক মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অনেক নীচমনা লোকে মনে করিয়াছিলেন যে, জাপানীরা রুষদিগের ভয়ে ঐরূপ করিয়াছিলেন। যাঁহারা জাপানীজাতির উদার চরিত্রতা, আত্মসংযম-ক্ষমতা, নম্রতা এবং স্বার্থত্যাগের উদাহরণ দেখি-

য়াছেন তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে, উহা জাপানীদের জাতিগত সদ্‌গুণের ফল।

জাপানীদের ন্যায় আত্মসংযম-ক্ষমতা জগতে অন্য কোনও জাতির মধ্যে একজনেরও আছে কিনা সন্দেহ। প্রাণাধিক পুত্রকন্যাদির মৃত্যুতেও অবিচলিত থাকিতে পারে, এমন মাতা পিতা জগতের আর কোথায় আছে?

এইরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন একটী দেশ যে সহসা উন্নতির চরম সীমায় উঠিবে তাহার আবার বিচিত্রতা কি?

ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যতে জাপান সভ্য জগতের কোথায় স্থানাধিকার করিবে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই সম্বন্ধে মারকুইস্ * ইতো (পরে ইনি প্রিন্স হইয়াছিলেন) যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ যোগ্য। এই মহাত্মাই জাপানের প্রকৃত নির্ম্মাতা। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইনি যেরূপ আশা করিতেন অনেকাংশে তাহা পূর্ণ হইয়াছে এবং হইবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইনি ইউরোপ এবং আমেরিকা হইতে Financial System পাঠ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে আমেরিকায় যে বক্তৃতা করেন নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

"পাশ্চাত্য জাতিগণের ন্যায় প্রাচ্য জাতিসমূহ সভ্যতার চরম সীমায় পৌছছিতে পারে নাই কেন? এই প্রশ্নটী স্বভাবতঃ আমাদের মনে উদয় হইয়া থাকে। ধর্ম্ম কিংবা লোকবলের অভাব ইহার কারণ নহে। প্রাচ্য দেশ সমূহের শাসন-পদ্ধতির দোষেই আমরা এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরা সেই সমস্ত দোষ বুঝিতে পারিয়াছি এবং সেই কারণেই আমরা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষা (General Education) দিয়াই

---

* 'ইনোউয়ে,' 'ইয়ামাগাতা' 'মাৎসুকাবু' ওকুমা, কাৎসুরা প্রভৃতি ব্যক্তিগণও জাপানের নির্ম্মাতা বলিয়া ইহার ইতিহাসে স্থান পাইবেন।

আমরা ক্ষান্ত হই নাই। রাজনৈতিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছি। কারণ বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই প্রকৃত পক্ষে সভ্যতার মাত্রা নির্দ্দেশ করে। যে জাতি যত বেশী বৈজ্ঞানিক চর্চ্চায় সফলতা লাভ করিয়াছে, সে সেই পরিমাণে সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে।

"জাতীয় বল কিংবা ব্যক্তিগত দৈহিক শক্তির সহিত সাম্রাজ্যের উত্থান এবং পতনে কোনও সম্বন্ধ নাই। ইজিপ্ট, ভারতবর্ষ, গ্রীস্ এবং রোম প্রভৃতি দেশের পতন দৈহিক শক্তির অভাবে হয় নাই, মানসিক শক্তির হ্রাস পাওয়ায় ঐ সমস্ত দেশ এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। জাপান এতদিন পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের অভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গে আসিয়া বুঝিতেছি যে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি না। এই কারণেই আমরা ইউরোপ এবং আমেরিকার সভ্যতা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে আমরাও জাপানে বৈদেশিক শিল্প এবং বিজ্ঞান বিস্তার করিতেছি এবং ইহার সুফলও আমরা ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে।

"শিল্প এবং বিজ্ঞানক্ষেত্রে জাপান আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে। এবং এই জন্যই এক্ষণে আমরা বৈদেশিক Finacial Systemএর তত্ত্বানুসন্ধানে আসিয়াছি। কতিপয় বৎসরের মধ্যে আমরা সর্ব্ববিষয়ে যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছি এবং আমাদের জনসাধারণের যেরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে আমার খুবই ভরসা হয় যে অতি সত্বরই জাপান সভ্য-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

"এক্ষণে আমাদের মধ্যে বিবিধ মতাবলম্বী লোক বিদ্যমান রহিয়াছেন।

ইহাঁদের মধ্যে কেহ Radicals, কেহ Rapid Progressionists, কেহ বা Conservatives। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা সভয়ে এবং অতি ধীরে ধীরে উন্নতির মার্গে অগ্রসর হইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই আশঙ্কা এই যে সমাজের ও গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন ঘটিলে ইহাঁদিগকে অনেক পূর্ব্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। ইহাঁরা অনেক সময়ে অলীক অশুভ কল্পনা করিয়া অমূল্য সময় বৃথা কাটাইতেছেন।

"আমাদের মধ্যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোক থাকায় অনেকে ভাবিতে পারেন, উহা আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু আমার মনে হয় যে উহাই আমাদের জাতীয় শক্তির উপাদান (Elements of strength) স্বরূপ; কারণ আমেরিকার শাসন প্রণালীর প্রতি দৃক্‌পাত্ করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান্ হইবে যে জনসাধারণের আন্দোলনের উপরই উহার শক্তি নির্ভর করিতেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে যত বেশী বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক থাকেন গবর্ণমেণ্টের শক্তি এবং সফলতা তৎপরিমাণে উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেরূপ বুঝিতেছি তাহাতে বোধ হয় সভ্যতা এবং উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিতে জাপানের আর বেশী দিন লাগিবে না। কারণ আমরা লোকশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ধনাগমের পথও প্রশস্ত করিয়া দিতেছি।

"আমার আশা হয় যে ভবিষ্যতে জাপান এবং আমেরিকার সম্বন্ধ এরূপ ঘনীভূত হইবে যে তাহারা একত্রে মিলিত হইয়া জগতের অন্যান্য জাতির মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য সমুদয় জাতিকে নৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ সমাজে পরিগণিত করিবে।"

উপরে প্রিন্স 'ইতো'র যে মন্তব্য লিখিত হইল তাহা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ দেখুন যে জাপানের উদ্দেশ্য কত সাধু। মহাত্মা ইতোর আশা ও

ভরসা যে প্রতিপদে পূর্ণ হইবে বর্ত্তমান জাপানী-জীবনে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। পৃথিবীর সমগ্র জাতিনিচয়কে একত্রিভূত করিতে হইলে এইরূপ একটী বিনয়ী জাতির যত্ন এবং চেষ্টা ফলবতী হইবার খুবই সম্ভব। অহঙ্কারী এবং উদ্ধত জাতির পক্ষে এরূপ সদনুষ্ঠান কখনই সম্ভবপর নহে।

সমাপ্ত

সচিত্র

জাপান প্রবাস

সম্বন্ধীয় অসংখ্য অভিমতের মধ্যে নিম্নে কয়েকটী মাত্র প্রদত্ত হইল।

The Indian Mirror, 21st Sept. 1910.

The book before us is named *"Japan Probash"* or Sojourn in Japan, written by Babu Manmatha Nath Ghose M. C. E. (Japan), M.R.A.S. (Lond.), Organiser of the Jessore Comb, Button and Mat Factory. ... ...
... ...

The style of the book *is simple, and the descriptions quite picturesque.* Within a short compass, the author has compressed a mass of interesting information which will be of great use to those who may desire to know or visit the country. ... ...
... ...

Turning to the social life of the Japanese, our author gives an interesting account of the various social customs and usages in Japan, and it is remarkable that not a few find their parallel in India. ... ...
... ...

He managed to cultivate an excellent knowledge of the Japanese language, and even of several local dialects. Under the circumstances, it is not to be wondered at that *he gained a true insight into the life and character of the Japanese people,* which is reflected in the pages of the book that he has compiled for the delectation of his countrymen.

A. B. Patrika, Oct 4, 1910 :—

"Japan Probash."—This is a nice volume written by Babu Manmatha Nath Ghosh M.C.E.;M.R.A.S.,who went to Japan to learn industries and arts and is now in charge of the Jessore Comb and Button Factory. Babu Sarada Charan Mittra has written an introduction to this book, in which *he highly speaks of it*. At the present time many are going to Japan to learn several practical industries and many have returned and they are in charge of several factories. Unfortunately, however, all do not hold quite an agreeable view of Japan and her people. Manmatha Babu, however, has nothing but praise for Japan ; indeed, he can not but speak of the country except in glittering terms ; he finds the country and her natural sceneries beautiful, the character of the nation perfectly a model one and hopes that Japan will continue to rise till it reaches the highest pinnacle of glory, which she is destined to. He, however, does not hold the same view with regard to China. It will be clearly seen that Manmatha Babu tried to dive deep into the secrets of Japan society and elicited facts which are not marked by ordinary observers who only look to the surface of things. He has described a parting scene with a Japan family where he had for sometime lived as a family member and none can read it without being deeply affected. Besides Japan, the author has given many interesting facts regarding Penang, Singapur, Hongkong and other places which he visited on his way to Japan and back. What

has made the book specially attractive is that the author has never tried to make it heavy by the introduction of polemical subjects ; but has narrated the incidents and his experiences in simple language in a manner that the reader is carried away with his ideas. The book also contains some beautiful scenes of Japan and her people.

Telegraph, 20th, Sep. 1910.

Japan-Probas.—By Srijut Manmatha Nath Ghosh M.C.E., (Japan), M.R.A.S. (Lond.). To be had at all principal book-sellers at Calcutta. Price Rs. 1-4.

The book, as its name implies, is a sketch of the life spent by the author in the 'Land of the Rising Sun' and the experiences he gathered there during his sojourn. The author is undoubtedly *a gifted young man* who has made most of the time he was allowed to stay in Dai Nippon as an ardent student of some of its arts and industries.

... ...

We do not hesitate to say that he has been eminently successful in the task he has underataken to give a fair idea of the manners and customs, the every-day-used language, in fact everything to be learnt of the people, and the inner workings and mysteries of the great factories of Japan where people flock from distant lands to gather knowledge and experience. What is more he has presented his picture of Japan before the public in *a simple, chaste and elegant language* which certainly redounds to his credit as a young author. The book is printed in good paper and is nicely bound so as to be easily attractive.

Mr. S.K. Agasti M.A., C.S., Magistrate & Collector, Jessore writes under date 8-10-10 :—

I have read the book *"Japan-Probas"* with very great pleasure. It is most interestingly and instructively written and *reads almost like a romance*. The author, Mr. Ghose, I am sure, will be in a position to enrich our vernacular literature with other and more ambitious contributions in the near future. He seems to have utilized his time in Japan to the utmost advantage. The "Land of the Rising sun" has given him an inspiration which he is trying to realise in an industrial enterprise for which I venture to predict a large future. His book should be in the hands of every well-wisher of the country and I am sure it will command a large sale. I wish its enterprising author every success in life.

Mohamohopadhaya Pundit Haroproshad Sastri M.A., C.I.E. writes under date Sept. 11, 1911 :—

My dear Monmatha Babu,

It is rarely our lot to read *such a good book in Bengali* as your 'Japan-Probash'. The subject of Japan, its inhabitants, its religion, it industries, its manners and its customs cannot but be interesting and attractive. But you have made it still more attractive by your appreciative spirit, your candour and specially by your charming Bengali. To cut the story short, *I have enjoyed your book thoroughly*.

Yours sincerely

(Sd). Haroprosad Shastri.

সঞ্জীবনী—১৯ শে আশ্বিন ১৩১৭ সাল।

জাপান প্রবাস।—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই প্রণীত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মন্মথ বাবু শিক্ষা লাভার্থ জাপানে গমন করিয়া তথায় ৩ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূয়োদর্শনের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকে জাপানের নানা বিষয়ক চিত্র দেওয়াতে গ্রন্থ খানি মনোহর হইয়াছে।

জাপানের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শক্তি সামর্থ জানিতে অনেকেই উৎসুক। যাঁহারা জাপান যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। যাঁহারা স্বদেশের সীমার বাহিরে যাইবেন না, তাঁহারাও ঘরে বসিয়া জাপানের তত্ব পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন। এই পুস্তকে একখানি সুন্দর জাপানী প্রহসনের অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গবাসী—১৪ই আশ্বিন ১৩১৭ সাল।

জাপান প্রবাস। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই, (জাপান) প্রণীত। কলিকাতা ৫৭।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট এম্পায়ার লাইব্রেরী হইতে এস ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। গ্রন্থকার শিল্প শিক্ষার্থে জাপানে গিয়াছিলেন। জাপানে অবস্থিতি তিন বৎসর কাল; সুতরাং বলাই বাহুল্য, ইনি জাপানের নিগূঢ় তথ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। এ গ্রন্থে সেই অভিজ্ঞতার পূর্ণ পরিচয়।

হিতবাদী—৩১শে ভাদ্র ১৩১৭ সাল।

জাপান প্রবাস। যশোহরের চিরুণী ও বোতামের কারখানার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই; এম, আর, এ, এস, প্রণীত। মূল্য ১।০ মাত্র। যশোহরে উক্ত কারখানায় গ্রন্থকারের নিকটে পাওয়া যায়। আমরা

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। শিল্প শিক্ষার জন্য মন্মথ বাবু তিন বৎসর কাল জাপানে অবস্থান করিয়া জাপান ও জাপানী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তকের অনেকগুলি প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বে হিতবাদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং এই পুস্তকের প্রশংসা আত্ম-প্রশংসা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এই ভয়ে আমরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে পারিলাম না। তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিতে পারি যে যাঁহারা জাপানে যাইবার ইচ্ছা করেন এই পুস্তক তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য। আর যাঁহারা গৃহে বসিয়া সুদূর জাপানের সুস্পষ্ট চিত্র দেখিতে চাহেন, তাঁহারা এক টাকা চারি আনা ব্যয় করিয়া এই পুস্তক ক্রয় করিলে হতাশ হইবেন না। পুস্তকখানি সচিত্র, সুতরাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বসুমতী—২২শে আষাঢ় ১৩২০ সাল।

জাপান-প্রবাস।—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় জাপানে শিল্পশিক্ষা করিয়া আসিয়া যশোহরে একটি চিরুণীর কারখানার তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন। এই কার্য্যে তিনি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। আজকাল অনেক যুবক শিল্পশিক্ষার্থ জাপানে যাইতেছেন। 'জাপান-প্রবাস' তাঁহাদের কাজে লাগিবে। 'জাপান-প্রবাস' সুখপাঠ্য, বহু জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানির মূল্য একটাকা চারি আনা মাত্র।

বামাবোধিনী—ভাদ্র ১৩১৭ সাল।

আমরা জাপান-প্রবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম, সি, ই, মহাশয় প্রণীত "জাপান প্রবাস" নামক একখানি পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

পুস্তকখানির উপরে স্বর্ণ অক্ষরে লতাপাতা মণ্ডিত নাম, বাঁধাই সুন্দর ; ইহাতে দ্বাদশখানি সুন্দর চিত্র আছে।

গ্রন্থখানির বাহ্যিক আকার সুন্দর হওয়ায় যেমন স্বতঃই নয়নকে আকৃষ্ট করে, তেমনি গ্রন্থকর্ত্তার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং বর্ণনা সকল মনোরঞ্জক হওয়ায় চিত্তকে অধিকতর আবদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ করে।

ইহাতে জাপানীদের কি সামাজিক, কি নৈতিক, সমুদয় বিষয় অতি সুন্দররূপে বিবৃত আছে। এতদ্ভিন্ন তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের বর্ণিত বিষয়, সকলেরই চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানি উপাদেয় সন্দেহ নাই। জাপান-প্রবাসার্থীর পক্ষে ইহা অমূল্য গ্রন্থ। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রত্যেক যুবকের ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিকৃষ্ট উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে যে তাহাদের চরিত্রের উন্নতি এবং নীতিশিক্ষা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; অধিকন্তু জীবনের কি মূল্য, তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

জাপ-রমণিদিগের বাক্য বিনিময় এবং 'ওবা'সানের জীবনবৃত্তান্তবর্ণনায় কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকারের বা গ্রন্থের কোনও অপযশ হইতে পারে না। চরিত্রবর্ণনকালে চরিত্রের সমুদয় অংশ দেখান স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত সকল অংশই অতি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

এদেশের রমণীগণের ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহাদের অধিকাংশই নিজেদের জীবনের সহিত জাপানরমণীদের জীবনের তুলনা করিলে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন যে, কিরূপ অমূল্য সময় তাঁহারা বৃথা যাপন করিতেছেন।

পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শারদীয় পূজা সম্মুখে, পুরস্কার দিবার পক্ষে ইহা অমূল্য গ্রন্থ। অনেকে এই সময় উপন্যাসাদি ক্রয় করিয়া উপহার দিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহারা যদি এইখানি উপহার প্রদান

করেন, তবে পুরস্কৃত ব্যক্তি পাঠ করিয়া যে নিশ্চয়ই উপকৃত এবং প্রীত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকাটী পাঠ করিলেই পুস্তকের সার মর্ম্ম বুঝা যায়। জাপানী প্রহসনটী কেবলই হাস্যোদ্দীপক। মূল্যও অল্প, এক টাকা চারি আনা মাত্র। ইহা কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং গ্রন্থপ্রণেতার নিকট প্রাপ্তব্য। আমরা গ্রন্থকারের অপর দুইখানি পুস্তকপাঠের আশায় রহিলাম।

BENGAL LIBRARY